# মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা

মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার

# মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা

মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার

ভূতপূর্ব অধ্যাপক
কৃষিতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট
শেরেবাংলা নগর ঢাকা

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০৩/জুন ১৯৯৬

বাএ (৯৫-৯৬ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি : ৩) ৩৩৭৬
মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জীকৃচি ২২৪

প্রকাশক
মুহম্মদ মুজাদ্দেদ
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
মো: আবদুল ওদুদ

মূল্য
ষাট টাকা

MRITTIKA BABOSTHAPANA ( Soil Management ) by MD. Nazrul Islam Talukdar. Published by Muhammad Mujadded, Director (in-charge), Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000. Bangladesh. First Edition : June 1996. Price : Tk. 60.00 only.

ISBN 894-07-3385-0

BANSDOC Library

আমার জান্নাতবাসী
মা ও বাবার স্মরণে

# লেখকের কথা

মৃত্তিকা বাংলাদেশের একটি বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ। অথচ এর উন্নয়নে সর্বস্তরের মানুষের অনীহা একে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয় চিন্তা করেই কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং কৃষি পেশায় নিয়োজিত সকলের দিকে লক্ষ্য রেখে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বইটি লেখা হলো। এই বই পড়ে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় করেও কিছুমাত্র আগ্রহ বাড়লেও বইটি লেখা সার্থক হয়েছে মনে করবো।

মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বইটি মূলত শস্য উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হলো। তাই কিভাবে বিভিন্ন পরিচর্যার মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রক্ষা করে আশানুরূপ শস্য উৎপাদন করা সম্ভব, সেই বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ মৃত্তিকাবিজ্ঞান বা মৃত্তিকা রসায়ন যতোটা সম্ভব পরিহার করা হয়েছে। তবে যেখানে যতোটুকু প্রয়োজন, তা অবশ্যই রাখার চেষ্টা করা হলো।

বইটিতে সমস্যাপূর্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল, বিশেষ করে উপকূলীয় লবণাক্ত মৃত্তিকা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। যেহেতু এ বিষয়টি আমাদের অনেকেরই কাছে ততোটা পরিচিত নয়, তাই বিশদ আলোচিত এ অধ্যায়টি ছাত্র-ছাত্রী ও কৃষি পেশায় নিয়োজিত সকলের উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি।

চেষ্টা করেও বইটি ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব হলো না। পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে অধিকতর সচেষ্ট থাকবো। বইটি লেখা ও প্রকাশে যাঁরা আমাকে উপদেশ ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবার জন্য আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

সর্বোপরি বইটি প্রকাশের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বাংলা একাডেমীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

জুন, ১৯৯৬

মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার

# সূচিপত্র


প্রথম অধ্যায় : সাধারণ আলোচনা ১

দ্বিতীয় অধ্যায় : মৃত্তিকা গঠন ও বুনট ৩ ; মৃত্তিকা গঠন ৩ ; মৃত্তিকা বুনট ৭।

তৃতীয় অধ্যায় : মৃত্তিকা পানি ১১ ; মৃত্তিকার পানি ও বায়ু সম্পর্ক ১১ ; মৃত্তিকা পানির শ্রেণীবিভাগ ১৪ ; মৃত্তিকা রস সংরক্ষণ ১৮।

চতুর্থ অধ্যায় : মৃত্তিকা জীব ২২ ; প্রাণী ২২ ; উদ্ভিদ ২৩।

পঞ্চম অধ্যায় : মৃত্তিকা উর্বরতা এবং উৎপাদনক্ষমতা ৩১ ; মৃত্তিকা উর্বরতা ৩১ ; মৃত্তিকার উৎপাদনক্ষমতা ৩১ ; মৃত্তিকার উর্বরতা প্রভাবীকরণ ৩২ ; মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি ও রক্ষার উপায় ৩৪।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভূমি কর্ষণ ৪০ ; ভূমি কর্ষণের উদ্দেশ্য ৪১; ভূমি কর্ষণের গভীরতা ৪৪।

সপ্তম অধ্যায় : উদ্ভিদ পুষ্টি ৪৭ ; জৈব সার ৪৭ ; জৈব পদার্থের উৎস ৪৯ ; জৈব পদার্থের গঠন এবং পুষ্টি উপাদান ৫০ ; জৈব পদার্থের বিযোজন ৫২ ; কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত ৫৪ ; জৈব পদার্থের উপকারিতা ৫৬ ; জৈব পদার্থ বৃদ্ধির উপায় ৫৮ ; অজৈব সার ৬০।

অষ্টম অধ্যায় : পানি নিষ্কাশন ৬৮ ; পানি নিষ্কাশনের গুরুত্ব ৬৮ ; অতিরিক্ত পানির ক্ষতিকর প্রভাব ৬৮ ; অতিরিক্ত পানির উৎস এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা ৭২ ; পানি নিষ্কাশনের উদ্দেশ্য ৭৩।

নবম অধ্যায় : ভূমিক্ষয় ৭৬ ; ভূমিক্ষয় শ্রেণীবিভাগ ৭৭ ; ভূমিক্ষয়ের কারণ ৭৯ ; ভূমিক্ষয়জনিত ক্ষতি বা ভূমিক্ষয়ের অপকারিতা ৮৩ ; ভূমিক্ষয় রোধ ৮৪।

দশম অধ্যায় : বাংলাদেশের সমস্যাপূর্ণ মৃত্তিকা ও তার সম্ভাব্য সমাধান ৮৮ ; সমুদ্রোপকূলের লবণাক্ত মৃত্তিকা ৮৮ ; লবণাক্ততার শ্রেণীবিভাগ ৮৮ ; লবণাক্ততার কারণ ৯২ ; উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি পরিবেশ ৯৩ ; প্রচলিত জমি ব্যবহাররূপ ৯৬ ; উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি কার্যক্রম উন্নয়নে বাধাসমূহ ৯৮ ; শস্যের লবণ সহিষ্ণুতা ১০০ ; লবণাক্ত এলাকার ফসল উপযোগিতা এবং চাষোপযোগী জমির পরিমাণ নির্ণয় ১০৩ ; উপকূলীয় অঞ্চলের সম্ভাবনাময় শস্যবিন্যাস ১১১ ; লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণে উন্নত চাষ পদ্ধতির ভূমিকা ১১২ ; পাহাড়ী মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ১১৭ ; বেলে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ১১৮।

গ্রন্থপঞ্জি ১২০।


BANBEDOC Library Dhaka

প্রথম অধ্যায়

# সাধারণ আলোচনা

(Introduction)

মৃত্তিকা বাংলাদেশের প্রধানতম প্রাকৃতিক সম্পদ। মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের উপর বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। এটি গাছ-পালার জন্ম ও বৃদ্ধির একমাত্র আশ্রয়স্থল। মৃত্তিকা ছাড়া গাছ-পালা সুষ্ঠুভাবে জন্মিতে পারে না। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সম্পদের উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ক্রমশই কমে আসছে। বাংলাদেশের সব এলাকার মৃত্তিকাই আজ প্রায় নির্জীব, পুষ্টিহীন। ফলে গাছ-পালার সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য এটি আর তেমন পুষ্টি যোগান দিতে পারছে না। শস্য, শাক-সবজি ও অন্যান্য গাছ-পালা থেকে আশানুরূপ ফলন পেতে হলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৃত্তিকার যে ব্যবস্থাপনা বা পরিচর্যা দরকার তা আজ কৃষককূল প্রায় ভুলেই গেছে। নিবিড় শস্য উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্তিকা থেকে অধিক শস্য পাওয়ার লোভে মৃত্তিকার যথাযথ পরিচর্যা না করে তারা শুধু ফসল চাষ করেই চলেছে। ফলে মৃত্তিকা হয়ে যাচ্ছে রুগ্ন ও দূর্বল। এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান সম্পদ মৃত্তিকা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দেশের অর্থনীতিতে দেখা দিতে পারে চরম বিপর্যয়। এ থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় হলো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব রকম শস্য এবং গাছ-পালার চাষাবাদ করে এদের ফলন লক্ষ্য মাত্রায় ধরে রাখা।

পৃথিবীতে জীবকূলের বেঁচে থাকার জন্য মৃত্তিকার প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ একত্রে বসবাস করে। প্রাণী জীবনধারণের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এসব উদ্ভিদ তাদের বৃদ্ধির জন্য আবার মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকা, পানি এবং সূর্যালোক মিলে গাছপালা ও বৃক্ষাদির বৃদ্ধি সাধন করে থাকে।

একজন সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্তিকা ভূ-পৃষ্ঠের উপর কিছু আবর্জনাস্তূপের ন্যায় মনে হতে পারে। একজন বিজ্ঞানীর কাছে মৃত্তিকা হলো জীবন্ত বস্তু যা ভূ-পৃষ্ঠকে একটি পাতলা আবরণে ঢেকে রেখেছে। বিভিন্ন অজৈবিক ও জৈবিক পদার্থ পানি, বায়ু এবং কোটি কোটি জীব-অণুজীবের সমন্বয়ে এই আবরণ গঠিত।

কিন্তু একজন কৃষিবিদের কাছে মৃত্তিকা হলো খাদ্য-শস্য এবং গাছ-পালার দাঁড়িয়ে থাকার এবং পুষ্টি উপাদানের প্রধান উৎস। এই মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক অবস্থার সঠিক সমন্বয় ঘটিয়ে আশানুরূপ ফসল উৎপাদনই হলো একজন কৃষিবিদের প্রধান কাজ।

BANSDOC Library
Accession No.....

## মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা

আশানুরূপ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূমি কর্ষণ, পুষ্টি উপাদান, পানি ও নিকাশ, মৃত্তিকা অণুজীব, ভূমিক্ষয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের যথাযথ সমন্বয় ঘটিয়ে মৃত্তিকা উর্বর ও উৎপাদনক্ষম রাখার কৌশলকেই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

মৃত্তিকা ও এর উর্বরতা হলো শস্য উৎপাদনের মূলধনস্বরূপ। ব্যবসায়ে অধিক লাভ পেতে হলে যেমন কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়, তেমনি কৃষি ব্যবসায়ের মূলধন মৃত্তিকা থেকে বছরের পর বছর প্রত্যাশিত উৎপাদন পেতে হলে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা রক্ষা করা অপরিহার্য। মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার আওতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত—

(১) মৃত্তিকা গঠন ও বুনট শ্রেণী
(২) মৃত্তিকাস্থ পানি, বায়ু এবং জীব–অণুজীব
(৩) মৃত্তিকা উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা
(৪) ভূমিকর্ষণ
(৫) পুষ্টি উপাদান
(৬) নিষ্কাশন ব্যবস্থা
(৭) ভূমিক্ষয়
(৮) মৃত্তিকা লবণাক্ততা

উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

# মৃত্তিকা গঠন ও বুনট

(Soil Composition and Texture)

মৃত্তিকা গঠন এবং এর বুনট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আশানুরূপ ফলন লাভের জন্য বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। মৃত্তিকা ও শস্যভেদে এর পরিচর্যা সঠিকভাবে না করলে কোনো শস্য থেকে বঞ্চিত ফলন লাভ করা যায় না। তাই সঠিক মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৃত্তিকা গঠন এবং এর বুনট শ্রেণী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

**মৃত্তিকা গঠন :** ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে যে নরম স্তরে গাছপালা তার মূল প্রতিষ্ঠাপূর্বক খাদ্যরস শোষণ করে বেঁচে থাকে তাকে মৃত্তিকা বলে। এই মৃত্তিকা পৃথিবীর একটি বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ। বিজ্ঞজনোচিতভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন অর্জন সম্ভব। এই লক্ষ্যেই মৃত্তিকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি।

মৃত্তিকা ৪টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে—খনিজ বা অজৈব পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি ও বায়ু। একটি আদর্শ মৃত্তিকায় সাধারণত শতকরা ৪৫ ভাগ খনিজ পদার্থ, ২৫ ভাগ পানি, ২৫ ভাগ বায়ু এবং ৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকে (চিত্র ১)।

তবে মৌসুম পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রধানত পানি এবং বায়ুর অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে। মৃত্তিকা উপাদানের এই অনুপাত মৃত্তিকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে থাকে। এসব উপাদান সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হলো।

**খনিজ বা অজৈব পদার্থ :** একটি আদর্শ মৃত্তিকায় ৪৫ ভাগ খনিজ পদার্থ থাকে। মৃত্তিকার আদি শিলার উপর ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়ার ফলে এগুলো ক্ষয় ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে খনিজ পদার্থের সৃষ্টি হয়। এটি মৃত্তিকার প্রধানতম উপাদান। মানব দেহের অস্থি কাঠামোর উপর রক্তমাংশ যোগ হয়ে যেমন দেহের সৃষ্টি হয়, তেমনি খনিজ পদার্থের কাঠামোর উপর পানি, বায়ু এবং জৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত হয় মৃত্তিকার দেহ তথা প্রকৃত মৃত্তিকা। মৃত্তিকার বালি, পলি এবং কর্দম কণা সবই খনিজ পদার্থ থেকেই সৃষ্টি হয়। মাটি থেকে উদ্ভিদ বিভিন্ন পুষ্টি যোগাড় করে থাকে।

**পানি :** পানির অপর নাম জীবন। গাছপালার সাবলীল বৃদ্ধি এবং প্রত্যাশিত ফলনের জন্য মৃত্তিকায় পরিমিত পারিমাণ পানির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। একটি আদর্শ মৃত্তিকায় পানির পরিমাণ ২৫ ভাগ। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে সার্বিক কৃষি উন্নয়নে পানির ভূমিকা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। এই মৃত্তিকা পানি সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

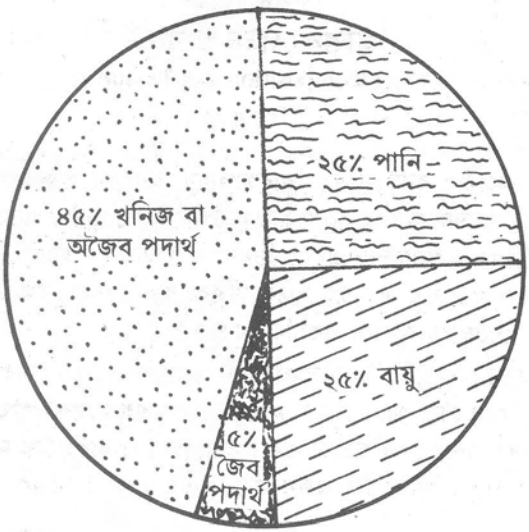


চিত্র ১ : মৃত্তিকা গঠন উপাদান

**বায়ু :** বায়ু মৃত্তিকার আর একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। একটি আদর্শ মৃত্তিকায় সাধারণত ২৫ ভাগ বায়ু থাকে। বায়ুমণ্ডলের বায়ু এবং মৃত্তিকা–বায়ুতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই–অক্সাইডের পরিমাণে কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। মৃত্তিকা–বায়ুতে এদের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৯·২০%, ২০·৬০% এবং ০·২৫%,পক্ষান্তরে বায়ুমণ্ডলের বায়ুতে যথাক্রমে ৭৮·০০%, ২১·০০% এবং ০·০৩%।

মৃত্তিকার রন্ধ্রপরিসরে বায়ু এবং পানি অবস্থান করে। গাছপালার শিকড়ের শ্বাস–প্রশ্বাস, নানাবিধ জীব–অণুজীবের বংশবৃদ্ধি এবং কর্মতৎপরতার জন্য মৃত্তিকাস্থ বায়ুর উপাদান অক্সিজেনের একান্ত প্রয়োজন। এই অক্সিজেনের অভাবে শিকড়ের শ্বসন কমে গেলে পুষ্টি পরিশোষণ হ্রাস পায়, কোষ প্রাচীরের সজীবতা থাকে না এবং পরিশেষে শিকড় পচে যায়, ফলে গাছপালার মৃত্যু ঘটে। বায়ুর কার্বন ডাই–অক্সাইড পানিতে মিশে যে কার্বনিক এসিড তৈরি করে তা মৃত্তিকার নানা জটিল পুষ্টি উপাদান দ্রবীভূত করে গাছের জন্য গ্রহণযোগ্য করে তোলে। বায়ুর নাইট্রোজেন শিমজাতীয় গাছের মূলে জমা হয়ে পরবর্তীতে তা পচে গাছের কাজে লাগে। মৃত্তিকা বায়ু বিভিন্ন অণুজীবের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে, ফলে গাছের জন্য উপকারী নানাবিধ পচনক্রিয়া সংঘঠিত হয়।

কোনো একটি বিশেষ প্রকারের মৃত্তিকা বুনট সেই মৃত্তিকার বায়ু ধারণের পরিমাণ প্রভাবিত করে থাকে। বেলে, হাল্কা মৃত্তিকার রন্ধ্রপরিসর বড় বলে এসব মৃত্তিকায় বায়ুর পরিমাণও বেশি। অপরদিকে পলি ও কর্দম কণাযুক্ত এঁটেল মৃত্তিকায় রন্ধ্রপরিসর ছোট বলে বায়ুর পরিমাণ কম। তবে সঠিক কর্ষণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব মৃত্তিকার কণা দানাদার করে এর বায়ু এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। পানি নিষ্কাশন, জৈব পদার্থ প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা মৃত্তিকায় বায়ুর পরিমাণ অধিকতর বৃদ্ধি করা সম্ভব।

উদ্ভিদ শিকড়ের শ্বসনের (শ্বাস-প্রশ্বাস) জন্য অনবরত অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন হয়। হেক্টরে গাছ যতো বেশি হয় এবং সতেজ হয়, অক্সিজেনের চাহিদাও ততো বেশি হয়। অক্সিজেনের ঘনমাত্রা শতকরা ১০ ভাগের উপর থাকলে অধিকাংশ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। মৃত্তিকায় অক্সিজেন সরবরাহ সীমিত হয়ে পড়ার সাথে সাথে অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধিহার হ্রাস পায়। অক্সিজেনের ঘনমাত্রা শতকরা ২ ভাগের কম হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি পুরোপুরি থেমে যায় এবং মরে যায়। মৃত্তিকায় পরিমিত পরিমাণ অক্সিজেন বিদ্যমান থাকলে উদ্ভিদের পক্ষে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান এবং পানি অধিকতর কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

বিভিন্ন উদ্ভিদের জন্য মৃত্তিকাতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। টমেটো, আলু, সুগারবিট, মটরশুটি এবং বার্লির অক্সিজেন চাহিদা বেশি। ভূট্টা, গম, সয়াবিন প্রভৃতি ফসলের জন্য কিছুটা কম অক্সিজেনের প্রয়োজন। জোয়ার কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে প্লাবিত অবস্থায় কয়েকদিন টিকতে পারে। সুদান ঘাস অনেক সীমাবদ্ধ অক্সিজেন সরবরাহের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে। সব রকম রোপা ধান গাছ বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে প্লাবিত অবস্থায় অক্সিজেন গ্রহণ করতে সক্ষম। ধানের গাছের উপরিভাগ বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে তা কাণ্ডের ভিতর দিয়ে শিকড়ে সরবরাহ করে থাকে। তাই পানির মধ্যে জন্মেও ধানগাছের কোনো অক্সিজেনের অভাব ঘটে না।

**জৈব পদার্থ :** মৃত্তিকা গঠনের আর একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হলো জৈব পদার্থ। একে মৃত্তিকার প্রাণ বলা হয়। এটি মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক ধর্ম উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে নিবিড় শস্য উৎপাদন কার্যক্রমে মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা রক্ষার্থে এর ভূমিকা অপরিসীম। ৫ম অধ্যায়ে আলাদাভাবে এর বিশদ আলোচনা করা হলো।

**মৃত্তিকা তাপ :** এটি মৃত্তিকা গঠনের প্রত্যক্ষ উপাদান না হলেও গাছপালার স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি এবং ফলনের জন্য মৃত্তিকায় পরিমিত পরিমাণ তাপের উপস্থিতি অপরিহার্য। এটি নানাভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মৃত্তিকার উর্বরতা এবং উৎপাদনশীলতা রক্ষার্থে মৃত্তিকাস্থ তাপ একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। মৃত্তিকার এই তাপের প্রধান উৎস সূর্য। তবে জৈব পদার্থের বিয়োজনকালেও কিছু পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

মৃত্তিকায় জৈব ও অজৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া, জীব-অণুজীবের ক্রিয়া, বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও বৃদ্ধি, শিকড়ের সতেজ বৃদ্ধি এবং পানি পরিশোষণ সবই মৃত্তিকা তাপ দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাপ বেশি হলে রন্ধ্রপরিসরে বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়। শীতকালীন শস্য বীজের অঙ্কুরোদগম তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ২০° সেলসিয়াস এবং গ্রীষ্মকালীন ফসলে বীজের অঙ্কুরোদগম তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ৩২° সেলসিয়াস। শীতপ্রধান দেশে বিশেষ করে মৃত্তিকার নিম্ন তাপমাত্রা বীজ অঙ্কুরোদগমে ভীষণ বাঁধার সৃষ্টি করে। মৃত্তিকার উপকারী অণুজৈবিক ক্রিয়া ১৮ থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে বাঞ্ছনীয় হারে ঘটে থাকে। তাপমাত্রা ১০° সেলসিয়াসের কম হলে এ সব কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে। উষ্ণ, সুনিষ্কাশিত মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া সবচেয়ে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। তাপমাত্রা ৪০° সেলসিয়াসের উপরে মৃত্তিকা অণুজীব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কম তাপমাত্রা উদ্ভিদের শিকড়ের পটাসিয়াম গ্রহণ কমিয়ে দেয়। দেখা গেছে যে, স্থায়ী উইলটিং বিন্দুতে মৃত্তিকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে উদ্ভিদ পানি পরিশোষণপূর্বক পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে।

সূর্যরশ্মি, মৃত্তিকা আর্দ্রতা, আচ্ছাদন, জমি কর্ষণ, ভূ-পৃষ্ঠের ঢাল ও অবস্থান, বুনট ইত্যাদির উপর মৃত্তিকার তাপ পরিশোষণ নির্ভরশীল। খাড়াভাবে পতিত সূর্যরশ্মি মৃত্তিকা দ্রুত উত্তপ্ত করে। উন্মুক্ত মৃত্তিকা আচ্ছাদিত মৃত্তিকার চেয়ে বেশি পরিমাণ তাপ পরিশোষণ করতে পারে। কিন্তু পরিশোষিত তাপ আচ্ছাদিত মৃত্তিকা উন্মুক্ত মৃত্তিকার চেয়ে বেশি সময় ধরে রাখতে পারে। এর ফলে আচ্ছাদিত বা জাবড়া ব্যবহৃত মৃত্তিকা বেশিক্ষণ উষ্ণ থাকে। আমাদের দেশে বিশেষ করে শীতকালে দক্ষিণ ঢালের মৃত্তিকায় বেশি পরিমাণ তাপ পরিশোষিত হয়। মৃত্তিকা বর্ণ এবং জৈব পদার্থের উপস্থিতিও মৃত্তিকার তাপ পরিশোষণ প্রভাবিত করে থাকে। হাল্কা বর্ণের মৃত্তিকার চেয়ে, জৈব পদার্থ মিশ্রিত গাঢ় বর্ণের মৃত্তিকা অধিক তাপ পরিশোষণ ও ধারণ করতে সক্ষম। তাছাড়া নিরেট, জমাট বাধা শক্ত মৃত্তিকার চেয়ে কর্ষিত মৃত্তিকা অধিক তাপ পরিশোষণ ও ধারণ করে থাকে। বেলে, বড় রন্ধ্রপরিসরযুক্ত মৃত্তিকা এঁটেলজাতীয় মৃত্তিকার চেয়ে খুব তাড়াতাড়ি তাপ পরিশোষণ করতে সক্ষম, কিন্তু তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা খুবই কম। যেহেতু গাছপালায় সুষম বৃদ্ধি ও ফলনের উপর মৃত্তিকাস্থ তাপমাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তাই এই তাপমাত্রা পরিমিত পরিমাণে রাখার জন্য মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যার দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। সুষ্ঠু পানি সেচ ও নিষ্কাশন, মৃত্তিকা দানাবন্ধন, জৈব পদার্থ প্রয়োগ এবং বিভিন্ন আন্তঃকর্ষণের মাধ্যমে মৃত্তিকায় যথাযথ তাপমাত্রা সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

তবে মৃত্তিকায় পরিমিত পরিমাণে রস সংরক্ষণ করা যতোটা সহজ, মৃত্তিকায় তাপ নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু ততো সহজ কাজ নয়। কারণ এক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রাধান্যই বেশি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিষ্কার বা সবুজ স্বচ্ছ পলিথিন কাগজ দ্বারা মৃত্তিকা ঢেকে দিয়ে তাপ কিছুটা বৃদ্ধি করা যায়। পলিথিন কাগজের ভিতর দিয়ে তাপশক্তি মৃত্তিকায় প্রবেশ করে। মৃত্তিকা থেকে তাপের বিকিরণ কম হয়, ফলে মৃত্তিকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বাষ্পীভবন কম হওয়ার দরুণ মৃত্তিকা রসও সংরক্ষিত হয়। শীতপ্রধান দেশে শাক-সবজি আবাদে এরূপ পলিথিন জাবড়ার প্রচলন দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে যে কোন জাবড়া মৃত্তিকার তাপমাত্রা ও রস সংরক্ষণকাজে খুবই সহায়ক।

**মৃত্তিকা বুনট :** কোনো মৃত্তিকার বিভিন্ন আকারের একক কণার পারস্পরিক অনুপাত দ্বারা সৃষ্ট স্থূলতা বা সূক্ষ্মতাকে মৃত্তিকার বুনট বলে। বিভিন্ন আকারের বালি, পলি এবং কর্দম কণা বিভিন্ন অনুপাতে মিশে একটি বিশেষ বুনট শ্রেণীর মৃত্তিকা সৃষ্টি করে। বুনট মৃত্তিকার একটি মৌলিক ও স্থায়ী ধরনের ধর্ম। মৃত্তিকার ভৌত গুণাবলী বুনটের উপর নির্ভর করে।

বিভিন্ন বুনটের মৃত্তিকার ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। এই সমস্ত বৈশিষ্টগত কারণের জন্য এক এক শ্রেণীর মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এক এক রকম এবং এক এক ফসলের জন্য বিশেষ উপযোগী।

আন্তর্জাতিক পদ্ধতির আওতায় মৃত্তিকাকে ১২টি বুনট শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। মৃত্তিকার এই শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন ব্যাসের মৃত্তিকা কণায় অনুপাতের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। নিচে ১ ও ২ নং সারণিতে যথাক্রমে বিভিন্ন মৃত্তিকা কণার ব্যাস এবং বুনট শ্রেণী দেয়া হলো—

**সারণি ১ : মৃত্তিকা কণার ব্যাস**

| মৃত্তিকা কণার নাম | কণার ব্যাস (মিলিমিটার) | |
|---|---|---|
| | আন্তর্জাতিক পদ্ধতি | যুক্তরাষ্ট্র পদ্ধতি |
| খুব মোটা বালি | -- | ২.০০—১.০০ |
| মোটা বালি | ২.০০—০.২০ | ১.০০—০.৫০ |
| মধ্যম মোটা বালি | -- | ০.৫০—০.২৫ |
| সূক্ষ্ম বালি | ০.২০—০.০২ | ০.২৫—০.১০ |
| খুব সূক্ষ্ম বালি | -- | ০.১০—০.০৫ |
| পলি | ০.০২—০.০০২ | ০.০৫—০.০০২ |
| কর্দম | <০.০০২ | <০.০০২ |

**সারণি ২ : মৃত্তিকা বুনট শ্রেণী (আন্তর্জাতিক)**

| বুনট শ্রেণী | বালি ٪ | পলি ٪ | কর্দম ٪ |
|---|---|---|---|
| বেলে মাটি | ৮৮–১০০ | ০৩–০৭ | ০০–০৮ |
| বেলে দোআঁশ | ৭০–৯২ | ০০–১২ | ০৮–২৯ |
| দোআঁশ বালি | ৬৩–৮৮ | ০৩–২৫ | ০০–১২ |
| দোআঁশ | ৫০–৭৬ | ১০–২৫ | ১২–২৬ |
| পলি | ০০–৫০ | ৫০–১০০ | ০০–২৬ |
| পলি দোআঁশ | ২৫–৭৪ | ২৫–৫০ | ০০–২৬ |
| এঁটেল | ০০–৬৩ | ০০–২৫ | ৩১–১০০ |
| পলি এঁটেল | ০০–৩৪ | ২৫–৬০ | ৪০–৭৫ |
| বেলে এঁটেল | ৪৫–৬৫ | ০০–২০ | ৩৪–৪০ |
| পলি এঁটেল দোআঁশ | ০০–২০ | ৪০–৭৩ | ২৭–৪০ |
| এঁটেল দোআঁশ | ২০–৪৫ | ১৫–৫৩ | ২৭–৪০ |
| বেলে এঁটেল দোআঁশ | ৬৩–৮৩ | ০০–১০ | ১৭–৩০ |

মৃত্তিকা কণার (বালি, পলি ও কর্দম) পরিমাণের শতকরা হার ২ নং চিত্রে প্রদত্ত ত্রিকোণীতে প্রতিস্থাপন করেও মৃত্তিকার একটি বিশেষ বুনট শ্রেণীর নাম পাওয়া যায়। উল্লেখিত ২নং সারণির বুনট শ্রেণীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি বুনট শ্রেণী সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো —

**বেলে মাটি :** সাধারণত মরুভূমি, নদীর চর এবং সমুদ্র পাড়ে এ জাতীয় মাটি দেখা যায়। তবে মরা নদী যা পলি দ্বারা ভরাট হয়ে কখনো কখনো কৃষি জমির সৃষ্টি করে, সে সব মাটির কিছু নিচু স্তরেও এরূপ মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এ মাটি খুবই হাল্কা, কণাগুলো বড় বলে সচ্ছিদ্রতাও বেশি, ফলে পানি ধারণ ক্ষমতা খুব কম। এ মাটিতে বালি, পলি ও কর্দম কণার অনুপাত যথাক্রমে ৮৮–১০০, ৩–৭ এবং ০–৮। এ জাতীয় মাটির কণাগুলোর মধ্যে বড় বড় ফাঁক থাকে, ফলে এ মাটিতে পানি অতি সহজে চুয়ে নিচে চলে যায় এবং মাটি

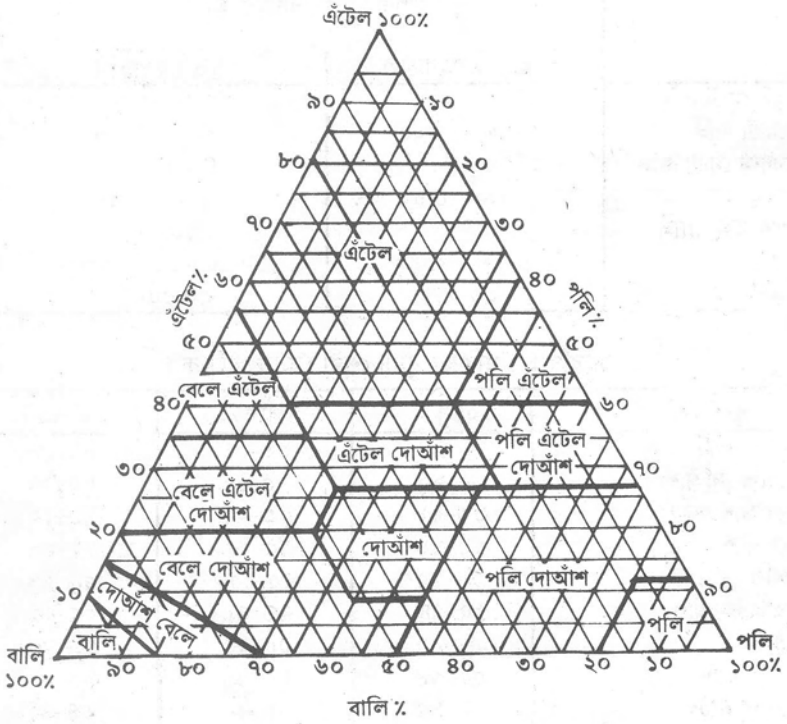


চিত্র ২ : মৃত্তিকার বুনট নির্ধারণে ইউ এস ডি এ ত্রিকোণী

তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। তবে বড় বড় ফাঁকের মধ্যে সহজেই বায়ু চলাচল করতে পারে। কর্দম কণার অভাব বলে এ মাটির নমনীয়তা খুব কম।

কৃষি কাজের জন্য এ মাটি উপযোগী নয়। জৈব পদার্থের অভাবহেতু এ মাটি অনুর্বর হয়ে থাকে। তবে চিকন কণাযুক্ত বেলে মাটিতে কোনো কোনো ফসল, যেমন—চীনা, কাউন, চীনাবাদাম, মিষ্টি আলু, তরমুজ, ফুটি প্রভৃতি ফসল চাষ করা যায়। প্রচুর পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করে আরও বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলানো সম্ভব। হেক্টর প্রতি ২০–২৫ টন জৈব সার প্রয়োগে এ মাটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নত করা যেতে পারে। তাছাড়া চাপড়াজাতীয় ফসলের চাষ করেও এ মাটির ভৌত ধর্ম উন্নত করা যায়।

**পলি মাটি :** বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নাংশ, তিস্তা প্লাবন ভূমি, করতোয়া প্লাবন ভূমি, গঙ্গা প্লাবন ভূমি প্রভৃতি অঞ্চল নদীবিধৌত পলি দ্বারা গঠিত। প্রতি বছর এইসব বিস্তীর্ণ এলাকা বর্ষা ও বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়, ফলে পানিবাহিত পলি জমে জমে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। পলি মাটির সচ্ছিদ্রতা কম বলে এ মাটির ভিতর দিয়ে বায়ু ও পানি চলাচল বেশ মন্থর। এ মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকায় পানি পরিশোষণ ও ধারণ ক্ষমতা বেশি। এ মাটির বালি, পলি ও কর্দম কণার অনুপাত যথাক্রমে ০–৫০, ৫০–১০০ এবং ০–২৬। বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের জন্য এ মাটি বেশ উপযোগী। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, গঙ্গা, পদ্মা. যমুনা, তিস্তা, করতোয়া প্রভৃতি নদ–নদী বিধৌত পলি মাটিতে ধান, পাট, আম, আলু, সরিষা, মশুর, কলাই এবং শাক–সবজি প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে।

**এঁটেল মাটি :** বাংলাদেশের মধুপুর অঞ্চল, বরেন্দ্র অঞ্চল, সিলেট বেসিন, পুরাতন মেঘনা মোহনা ভূমি প্রভৃতি মৃত্তিকা অঞ্চলে এঁটেল মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এ মাটিকে ভারী মাটিও বলা হয়ে থাকে। এ মাটিতে পলি ও কর্দমকণার ভাগ বেশি বলে এ মাটির সচ্ছিদ্রতা কম, ফলে পানি ও বায়ু চলাচলের ক্ষমতাও কম। এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি কিন্তু পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা কম। এ মাটিতে মৃত্তিকা–কণা সংযুক্ত হিউমাস বেশি পরিমাণে থাকায় এটি ভিজলে আঠার মতো এবং শুকালে খুব শক্ত হয়ে যায়। জমি কর্ষণ করার সময় এ জাতীয় মাটির ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ 'জো' মতো (মৃত্তিকার সরস অবস্থাকাল) জমি কর্ষণ না করলে মাটির গঠন সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 'জো'র অধিক রস থাকা অবস্থায় কর্ষণ করলে বড় বড় চাপড়ার মতো ওঠে এবং মাটি কাদা কাদা হয়ে যায়, ফলে এর গঠন নষ্ট হয়। পক্ষান্তরে 'জো'র কম রস নেমে আসলে এ মাটি ভীষণ শক্ত হয়ে যায় এবং কর্ষণ করাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় কর্ষণ করলে বড় বড় ঢেলা উঠে মাটির গঠন বিনষ্ট করে দেয়। তবে এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি, তাই রোপা ধান চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তাছাড়া ইক্ষু, পাট, তুলা, ভূট্টা, শাক–সবজি, কলা, আনারস প্রভৃতি ফসলও এ মাটিতে ভাল জন্মে। হেক্টর প্রতি প্রায় ৫–১০ টন জৈব সার প্রয়োগ করে এ মাটির ভৌত ধর্মের উন্নতিপূর্বক হাল্কা করা যায়।

**দোআঁশ মাটি :** পুরাতন হিমালয় পাদভূমি, যমুনা প্লাবন ভূমি, করতোয়া প্লাবন–ভূমি, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবন ভূমি, গঙ্গা প্লাবন ভূমি, মধ্য মেঘনা প্লাবন ভূমি, পুরাতন মেঘনা মোহনা

ভূবন, উত্তর-পূর্ব পাদভূমি, উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী ভূমি প্রভৃতি মৃত্তিকা অঞ্চলে এ জাতীয় মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এ মাটিতে পলি এবং কর্দম কণার ভাগ প্রায় সমান এবং বালি কণার পরিমাণ কিছু বেশি। বালি, পলি এবং কর্দম কণার ভাগ যথাক্রমে ৫০-৭৬, ১০-২৫ এবং ১২-২৬। ফসল উৎপাদনের জন্য এ মাটি খুব উপযোগী। প্রায় অধিকাংশ ফসলই এ মাটিতে আশানুরূপ ফলন দিয়ে থাকে। এ মাটির পানি পরিশোষণ ও ধারণ ক্ষমতা, নমনীয়তা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তোষজনক বলে চাষাবাদের জন্য এটি একটি আদর্শ মাটি হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মাটি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

**বেলে দোআঁশ :** দোআঁশ মাটিতে বালি কণার পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকলে তাকে বেলে দোআঁশ মাটি বলে। এ মাটিতে বালি, পলি এবং কর্দম কণার ভাগ যথাক্রমে ৭০-৯২, ০-১২ এবং ৮-২৯। এটি বেলে মাটি অপেক্ষা অধিক উর্বর। বায়ু এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। এ মাটি হালকা বলে কর্ষণ বেশ সহজ। যে সব ফসলের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা কম সে সব ফসল এবং কন্দালজাতীয় ফসল, যেমন—গোলআলু, মিষ্টি আলু, মূলা প্রভৃতি এ জাতীয় মাটিতে ভাল জন্মে।

**এঁটেল দোআঁশ :** যে সব দোআঁশ মাটিতে কর্দম কণার আধিক্য রয়েছে তাকে এঁটেল-দোআঁশ মাটি বলা হয়। এ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা দোআঁশ মাটি অপেক্ষা বেশি এবং স্বাভাবিক ভাবেই উর্বর। কিন্তু কোনো কোনো সময় এ মাটিতে নিকাশজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ জাতীয় মাটিতে খুব ভাল ফসল জন্মানো সম্ভব। রোপা ধান, পাট, তুলা, গম, বিভিন্ন শাক-সবজি প্রভৃতি ফসল এ মাটির জন্য উপযোগী।

তবে সাধারণত কৃষিকাজের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মৃত্তিকায় শতকরা ১০-২০ ভাগ কর্দম, ৫ ভাগ জৈব পদার্থ এবং অবশিষ্ট প্রায় সমানভাগে বালি ও পলি থাকা বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

# মৃত্তিকা পানি
(Soil Moisture)

মৃত্তিকা পানি বা রস গাছপালার স্বাভাবিক বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপাদান। তাই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় মৃত্তিকা পানি এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ অত্যন্ত প্রয়োজন। কৃষি কাজে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। জমি কর্ষণ থেকে শুরু করে বীজের অঙ্কুরোদগম, চারা বৃদ্ধি এবং এর পুষ্টিসাধন সবকিছুই মৃত্তিকার প্রয়োজনীয় রসের উপর নির্ভর করে। গাছপালায় শতকরা ৮০–৯০ ভাগ পানি থাকে। এই পানি গাছ শিকড়ের সাহায্যে মৃত্তিকা থেকে সংগ্রহ করে থাকে। মৃত্তিকায় প্রয়োগকৃত রাসায়নিক সার এই পানিতেই দ্রবীভূত হওয়ার পর গাছ তা শিকড়ের সাহায্যে পরিশোষণ করে। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ এবং প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে পানি। উদ্ভিদের দেহের প্রতিটি কোষের সজীবতা ও কার্যক্ষমতা রক্ষার্থে মৃত্তিকা রস অপরিহার্য। মৃত্তিকা গঠন, মৃত্তিকাস্থ জীব–অণুজীবের বংশবৃদ্ধি ও ক্রিয়াকলাপ এবং জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়ার জন্য মৃত্তিকায় প্রয়োজনীয় রসের উপস্থিতি আবশ্যক। পরিশেষে গাছের বাড়–বাড়তির পর ফুল এবং ফল উৎপাদনে মৃত্তিকা পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর মৃত্তিকাস্থ এই পানির উৎস হলো বৃষ্টিপাত, সেচ এবং জোয়ার।

গাছপালার জন্য প্রয়োজনীয় এই পানি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নানাভাবে অবস্থান করে। এই বিভিন্ন প্রকার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকা অভ্যন্তরস্থ পানিকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা—মুক্ত পানি (Free water), শোষিত পানি (Hygroscopic water) এবং নালিকা বা কৈশিক পানি (Capillary water)। মৃত্তিকা কণার মধ্যে পানি ও বায়ুর পরস্পর সম্পর্ক এবং অবস্থান মৃত্তিকার ভৌত ধর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তাই বিভিন্ন শ্রেণী পানির বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোকপাত মৃত্তিকাস্থ পানি বিষয়টিকে অধিকতর পরিষ্কার করে তুলতে সহায়ক হবে।

## মৃত্তিকার পানি ও বায়ু সম্পর্ক

উদ্ভিদের সাবলীল ক্রমবৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকার পরিমিত পরিমাণ পানি ও বায়ুর উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন। এই পানি ও বায়ু মৃত্তিকা কণার ফাঁকা স্থান বা রন্ধ্রপরিসরে অবস্থান করে। এই রন্ধ্রপরিসর কতকগুলো খুব ছোট আবার কতকগুলো বড়। ছোট, ক্ষুদ্রাকার রন্ধ্রপরিসরকে বলা হয় কৈশিক রন্ধ্রপরিসর (capillary pore) এবং বড় আকারের রন্ধ্রগুলোকে অকৈশিক রন্ধ্রপরিসর (non-capillary pore) বলা হয়। ছোট রন্ধ্রপরিসরের ব্যাস সাধারণত ০.০৩ মিলিমিটারের কম এবং বড় রন্ধ্র পরিসরের ব্যাস সাধারণত ০·০৬ মিলিমিটারের বেশি। কোনো

একটি বিশেষ শ্রেণীর মৃত্তিকায় রন্ধ্রপরিসরের মোট সংখ্যা এবং আকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরা মৃত্তিকার পানি ও বায়ু চলাচল প্রভাবিত করে। বালিজাতীয় মৃত্তিকার উপরিস্তরে মোট সংখ্যা সাধারণত ৩৫–৫৫% এবং বড় রন্ধ্রপরিসরের সংখ্যাই বেশি। পক্ষান্তরে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ বা এঁটেলজাতীয় মৃত্তিকায় রন্ধ্রপরিসরের মোট সংখ্যা ৪০–৬০% এবং ছোট রন্ধ্রপরিসরের সংখ্যা বেশি। একটি উন্নত গুণসম্পন্ন মৃত্তিকায় মোট রন্ধ্রপরিসরের সংখ্যা ৫০% এর কাছাকাছি এবং এর মধ্যে প্রায় ৩০ ভাগ বড় এবং প্রায় ২০ ভাগ ছোট রন্ধ্রপরিসর হওয়া বাঞ্ছনীয় (চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)। এই রন্ধ্রপরিসরের সংখ্যা মৃত্তিকার নিচের স্তরের চেয়ে উপরের স্তরে বেশি থাকে। জৈব পদার্থও উপরিস্তরে বেশি থাকে।

একটি আদর্শ মৃত্তিকায় প্রায় ৫ ভাগ জৈব পদার্থ, প্রায় ১০ ভাগ বালি, প্রায় ২৫ ভাগ পলি, প্রায় ১০ ভাগ কাদা, প্রায় ২০ ভাগ ছোট রন্ধ্রপরিসর এবং প্রায় ৩০ ভাগ বড় রন্ধ্রপরিসর থাকা বাঞ্ছনীয়। পলি দোআঁশ মৃত্তিকায় প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ প্রয়োগ এবং সঠিক আর্দ্রতায় ('জো' মতো) জমি কর্ষণ মৃত্তিকার এরূপ বাঞ্ছিত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

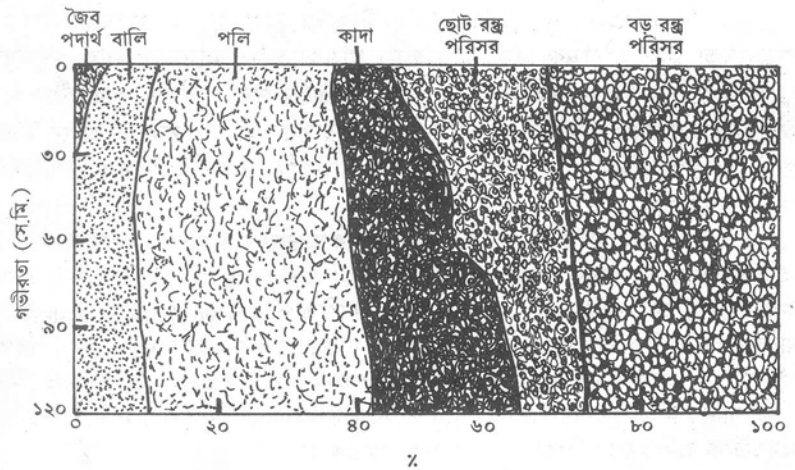


চিত্র ৩ : একটি আদর্শ মৃত্তিকায় বিভিন্ন উপাদানের হার (আয়তন ভিত্তিক)

শুষ্ক মৃত্তিকার সব ফাঁকাস্থান অর্থাৎ রন্ধ্রপরিসর বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে (চিত্র ৫ক)। এরূপ অবস্থায় মৃত্তিকায় সেচ দিলে বা বৃষ্টি হলে পানি বায়ু সরিয়ে দিয়ে সব রন্ধ্রপরিসব দখল করে নেয় (চিত্র ৫খ)। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে অকৈশিক রন্ধ্র পরিসরের পানি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিচের দিকে চলে যায় এবং বায়ু এসে পুনরায় এসব ফাঁকা রন্ধ্রপরিসর দখল করে (চিত্র ৫গ)। অতিরিক্ত পানি চলে যাবার পর কৈশিক রন্ধ্রপরিসরে মৃত্তিকা কণা ঘিরে যে পরিমাণ পানি অবস্থান করে তাকেই মৃত্তিকার সর্বোচ্চ পানিধারণ ক্ষমতা বলে।

মৃত্তিকা কণাসমূহ এদের গায়ে একটি পাতলা স্তরে পানি ধরে রাখে। কণা যতো ক্ষুদ্র ও গোলাকার হয় ধারণকৃত পানির স্তর ততো পুরু হয়। যে শক্তিতে মৃত্তিকাকণা এ পানি ধরে রাখে তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা বেশি বলে এ পানি নিচের দিকে যায় না। পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি কণার মধ্যে যে কৌণিক ফাঁক বা রন্ধ্রপরিসর থাকে তা উভয়ের ধারণকৃত পানি কণায় পূর্ণ হয়ে যায়। কৌণিক ফাঁকে অবস্থানরত এই পানিকেই কৈশিক পানি বলা হয়। কৈশিক রন্ধ্রপরিসরে পানি কণা মৃত্তিকা কণার গায়ে এঁটে লেগে থাকার (adhesion) দরুণ এবং রন্ধ্রপরিসরের মধ্যে পানি কণা পরস্পর আকর্ষণ শক্তিতে (cohesion) লেগে থাকার ফলে কৈশিক পানির সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ এই পানিই ব্যবহার করে। এর কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিলে যায়। ভারী বা এঁটেলজাতীয় মৃত্তিকায় মোট কৈশিক ফাঁক বা রন্ধ্রপরিসরের সংখ্যা বেশি বলে এ মৃত্তিকায় বেলে মৃত্তিকার চেয়ে পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি হয়ে থাকে। বেলেজাতীয় মৃত্তিকায় রন্ধ্রপরিসর আকারে বড় এবং সংখ্যায়ও কম বলে পানি ধারণ ক্ষমতা কম। এ জাতীয় মৃত্তিকায় পানির আনুভূমিক (নিচের দিকে) চলাচল খুব দ্রুত, ফলে পার্শ্বভূমিক চলাচলের বিস্তৃতি কম। অন্যদিকে কাদা, ভারী মৃত্তিকায় রন্ধ্রপরিসরের আকার খুব ছোট এবং মৃত্তিকা জমাট স্বভাবের জন্য আনুভূমিক চলাচল খুব মন্থর, ফলে পানি পার্শ্বে ছড়িয়ে পরার অধিক সময় ও সুযোগ পায়। তাই এরূপ মৃত্তিকায় পানি আনুভূমিক ও পার্শ্বভূমিক উভয়দিকেই প্রায় সমান বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে পরতে পারে (চিত্র : ৪ দ্রষ্টব্য)।

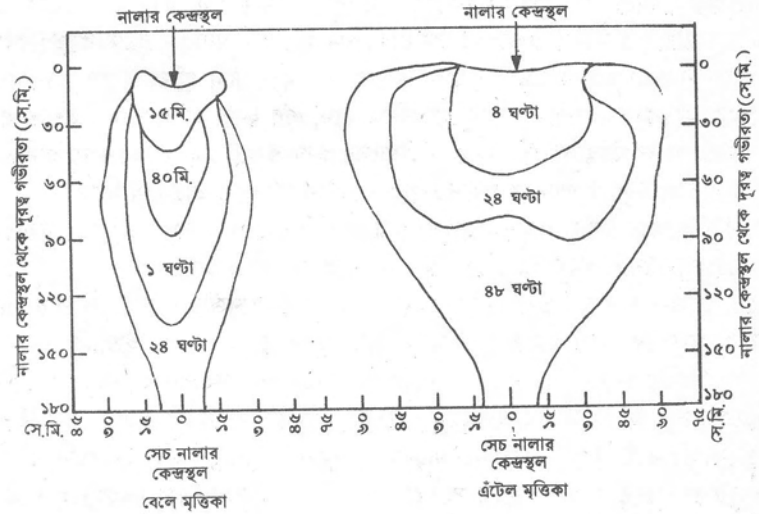


চিত্র ৪:বুনটভেদে মৃত্তিকা অভ্যন্তরে পানি চলাচলের ধরন

বেলে মৃত্তিকায় ২৪ ঘণ্টা পর যথাক্রমে পানির ১৮০ সে. মি. এর অধিক আনুভূমিক এবং প্রায় ৩০ সে. মি. পার্শ্বভূমিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পক্ষান্তরে কাদা, এঁটেল মৃত্তিকার ক্ষেত্রে ৪৮ ঘণ্টা পর যথাক্রমে ১৮০ সে.মি. এর অধিক অনুভূমিক এবং ৭৫ সে.মি. এবং অধিক পার্শ্বভূমিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাই মৃত্তিকা বুনটভেদে পানি সেচের জন্য সেচ নালার পরস্পর দূরত্ব, সেচের পানির পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ সুষ্ঠু মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ প্রয়োজন। শিকড়ের কাছকাছি মৃত্তিকায় পানির অভাব হলে চতুর্দিক থেকে পানি কৈশিক ফাঁকের ভেতর দিয়ে শিকড়ের দিকে গমন করে। শিকড় এলাকার সব মৃত্তিকাই হঠাৎ করে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায় না, কারণ ভূ-নিম্নস্থ পানিতল থেকে পানি অবিরাম উপরের দিকে উঠতে থাকে। ভূ-নিম্নস্থ পানি তল বেশ নিচে নেমে গেলেই তখনই কেবল উদ্ভিদের পানি সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় মৃত্তিকা খুব শুষ্ক হয়ে যায় এবং পানির মাত্র একটা পাতলা স্তর মৃত্তিকা কণাসমূহ ঘিরে এদের গায়ে এটে লেগে থাকে, যা গাছ ব্যবহার করতে পারে না।

## মৃত্তিকা পানির শ্রেণীবিভাগ

মৃত্তিকা পানির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে —

**মুক্ত পানি :** বৃষ্টিপাত বা সেচের পর প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে পানি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মৃত্তিকার নিচে চুঁয়ে অথবা পাশে গড়িয়ে চলে যায় তাকে মুক্ত পানি বলে। এ সময় মৃত্তিকা কণার ফাঁকে শুধু পানি থাকে, বায়ু থাকে না (চিত্র : ৫ খ)। জমি থেকে এই অতিরিক্ত পানি দ্রুত সরিয়ে ফেলা মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম প্রধান কাজ। কারণ এই পানি নানাভাবে গাছপালার ক্ষতিসাধন করে থাকে। মুক্ত পানি মৃত্তিকার সব রন্ধ্রপরিসর দখলপূর্বক মৃত্তিকাস্থ প্রয়োজনীয় বায়ু অপসারণ করে, এর ফলে অক্সিজেনের অভাবে ধান ছাড়া আর প্রায় সব উদ্ভিদের শিকড়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে এবং শিকড় পচে গাছ মরে যায়। আবার অতিরিক্তি পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টি উপাদান চোয়ানো প্রক্রিয়ায় নিচে চলে যায়, বিশেষ করে বালিজাতীয় মৃত্তিকায় এরূপ অপচয় বেশি ঘটে থাকে। যে সব জমিতে অতিরিক্ত পানি সরে যেতে বেশি সময় লাগে, সে সব জমিতে জলাবদ্ধতার কারণে অধিকতর সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন—শিকড় গভীরে যেতে পারে না, অপকারী অণুজীবের বংশবৃদ্ধি পায় ফলে ক্ষতিকর পচনক্রিয়া ঘটে থাকে। তাপমাত্রা হ্রাস, লবণ ও ক্ষার বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যাও অতিরিক্ত পানির কারণে দেখা দেয়। অতিরিক্ত পানিতে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নাইট্রিফিকেশন, নাইট্রোজেন সংবন্ধন, সালফার অক্সিডেশন প্রভৃতি জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই সুষ্ঠু নিষ্কাশনের মাধ্যমে মৃত্তিকার পরিমিত পরিমাণে পানি বা রস রাখার ব্যবস্থা করতে পারলে গাছের সতেজ বৃদ্ধি ঘটে এবং আশানুরূপ ফলনও লাভ করা সম্ভব হয়।

**শোষিত পানি :** শুষ্ক মৃত্তিকায় মৃত্তিকা কণা ঘিরে যে পানি খুব পাতলা পর্দা বা আবরণের ন্যায় অবস্থান করে তাকেই শোষিত পানি বলা হয়। এ সময় মৃত্তিকা কণার ফাঁকগুলো শুধু বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে ( চিত্র ৫ক)। এরূপ অবস্থায় মৃত্তিকা পূর্ণ শুষ্ক বলে মনে হয়। এই মৃত্তিকা ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে তখনই কেবল এই পানি জলীয় আকারে উঠে যায়। মৃত্তিকার এই পানি ফসলের কোনো কাজেই আসে না। মৃত্তিকা কণার সাথে এই পানি এমনভাবে এঁটে লেগে থাকে যে শিকড় তার শক্তি দিয়ে এটি শোষণ করতে পারে না। এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগেই ফসলের ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য মৃত্তিকায় অবশ্যই পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

**কৈশিক পানি :** এ পানি সম্বন্ধে পূর্বে কিছুটা অলোকপাত করা হয়েছে। যেহেতু মৃত্তিকায় এরূপ অবস্থানরত পানিই একমাত্র গাছের কাজে লাগে এবং এর বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন করে থাকে, তাই এ পানি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য এখানে আরো কিছু আলোচনা করা হলো।

মৃত্তিকার রন্ধ্রপরিসর বা কৈশিক ফাঁকে অবস্থানরত পানিই হচ্ছে কৈশিক পানি। এ পানি কৈশিক শক্তির প্রভাবে উপরের দিকে চলাচল করে। দু'মুখ খোলা একটি সরু কাঁচের নল পানিতে ডুবালে যেভাবে নলের মধ্য দিয়ে পানি উপরের উঠে আসে ঠিক একইভাবে মৃত্তিকাস্থ এই পানি রন্ধ্র পরিসর বা নালিকার ভেতর দিয়ে উপরে উঠে। রন্ধ্রপরিসর যতো সরু হয় পানির স্তম্ভ ততো উঁচুতে উঠে। কোনো কোনো সময় মৃত্তিকার উপরভাগ শুষ্ক মনে হলেও পানির অভাবে গাছের ক্ষতি হয় না কারণ কৈশিক শক্তির প্রভাবে সূক্ষ্ম নালিকা দিয়ে, মৃত্তিকা রস নিম্নস্তর থেকে উপরস্তরে উঠে এবং গাছের কাজে লাগে। কখনো কখনো বৃষ্টির পর জমির উপরের স্তর শুকিয়ে চাপ বেঁধে যায়, ফলে পানি চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আঁচড়া বা নিড়ির সাহায্যে উপরের চাপবাঁধা মাটি ভেঙে ঝুরঝুরে করে দিলে কৈশিক শক্তির প্রভাবে নালিকা বা রন্ধ্রপরিসর দিয়ে মৃত্তিকাস্থ রস উপরে উঠে আসার ফলে বিশেষ করে বীজের অঙ্কুরোদ্গম বা গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধিতে আর কোনো বাঁধার সৃষ্টি হয় না।

বৃষ্টিপাতের ফলে বা জমিতে সেচ দিলে পানিতে মৃত্তিকা সম্পূর্ণভাবে ভিজে যায়, মৃত্তিকা কণার মাঝে মাঝে বায়ু দ্বারা পূর্ণ যে সূক্ষ্ম ফাঁক (রন্ধ্রপরিসর) থাকে সে ফাঁকগুলোতে বায়ু সরিয়ে পানি ঢুকে পড়ে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মেই মৃত্তিকা থেকে অতিরিক্ত পানি পার্শ্বে গড়িয়ে বা চুয়ানো প্রক্রিয়ায় নিচে চলে যায়। সাধারণত বেলে মাটিতে ২৪ ঘণ্টা এবং এঁটেল বা কাদাজাতীয় মাটিতে ৭২ ঘণ্টা ধরে এই অতিরিক্ত পানি অপসারিত হওয়ার পর একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রস অবস্থান করে মৃত্তিকায় যে অবস্থা সৃষ্টি করে, সেই অবস্থাকে মৃত্তিকার সরস অবস্থা বা (field capacity) বলা হয়। মৃত্তিকার এই সরস অবস্থার সময়েই গাছ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি রসের আকারে শিকড়ের সূক্ষ্ম লোমের সাহায্যে গ্রহণ করে থাকে। গাছ কর্তৃক এভাবে ক্রমাগত পানি বা রস শুষে নেয়ার ফলে মৃত্তিকা রস কমে গিয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌছে যে, শিকড় তার শক্তি-সামর্থ দিয়ে সেই রস আর শুষে নিতে পারে না। কেননা

BANGLADESH Library

মৃত্তিকার অতি ক্ষুদ্র কণাগুলোর মাঝে মাঝে ফাঁকাস্থানে মৃত্তিক কণা ঘিরে এ রস এমনভাবে আটকে থাকে যে, টেনে নিতে শিকড়ের অনেক শক্তির প্রয়োজন হয় যা কচি, নরম শিকড় লোমের থাকে না। মৃত্তিকার এই পর্যায়ের রসকেই শোষিত পানি বলা হয়। এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় রসের অভাবহেতু পাতা এবং গাছ শুকিয়ে হেলে পড়ে। এ সময় জমিতে পানি দিলেও গাছের সে পানি শুষে নেয়ার আর কোনো শক্তি থাকে না। গাছের এই অবস্থাকেই স্থায়ী হেলা-পড়া অবস্থা (permanent wilting point) বলা হয়।

কোনো শস্য থেকে আশানুরূপ ফলন পেতে হলে মৃত্তিকা সবসময়ই সরস অবস্থায় বা এর কাছাকাছি রাখতে হবে। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা শতকরা ৫০-৬০ ভাগে নেমে আসলে অর্থাৎ অর্ধেকের কিছু বেশি কমে গেলেও মৃত্তিকায় পুনঃ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারলে গাছ স্থায়ী হেলে-পড়া অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম। তাই অধিক ফলনের নিশ্চয়তার জন্য মৃত্তিকায় পানি ধারণ ক্ষমতা ৫০-৬০ ভাগে নেমে আসলেই জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা খুব সহজে নিম্ন পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।

সব রকম রোপা ধানের ক্ষেত্রে জমা পানি শুকিয়ে যাবার সাথে সাথেই ফসলে পুনঃ পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। রোপা ধানের দানা পুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত পানি সব সময়ই জমিতে জমিয়ে রাখতে হবে। দানা পুষ্ট হওয়ার পর জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে। এতে তাড়াতাড়ি ধান পেকে যাবে। অন্যান্য সব ফসলের ক্ষেত্রে মৃত্তিকার পানিধারণ বা রসের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য ফসলভেদে ৩০-১০০ সে. মি. নিচ থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট ফসলের শিকড়ের গভীরতার ৩ ভাগের ২ ভাগ অর্থাৎ শিকড়ের মোট দৈর্ঘ্যের ৬০-৭০ ভাগ নিচ থেকে মাটি খুঁড়ে তার এক মুঠো হাতের মুঠিতে নিয়ে চাপ দেয়ার পর সারণি-৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জমির বিভিন্ন জায়গা থেকে নেয়া কয়েকটি নমুনার গড় এ ব্যাপারে সঠিক নির্দেশ প্রদান করতে পারে।

নিচে সারণি-৩এ মৃত্তিকার প্রধান কয়েকটি বুনট শ্রেণীর রস বা পানি ধারণ ক্ষমতা দেখানো হলো—

সারণি ৩ : মৃত্তিকার রস ধারণ ক্ষমতা

| মৃত্তিকা বুনট শ্রেণী | রস ধারণ ক্ষমতা ( ٪ ) |
|---|---|
| মোটা বেলে মৃত্তিকা | ১৫·০০—৩১·০০ |
| হাল্কা দোআঁশ মৃত্তিকা | ২২·৬০—৩৩·০০ |
| ভারী এঁটেল মৃত্তিকা | ৩৬·১০—৪৯·৬০ |

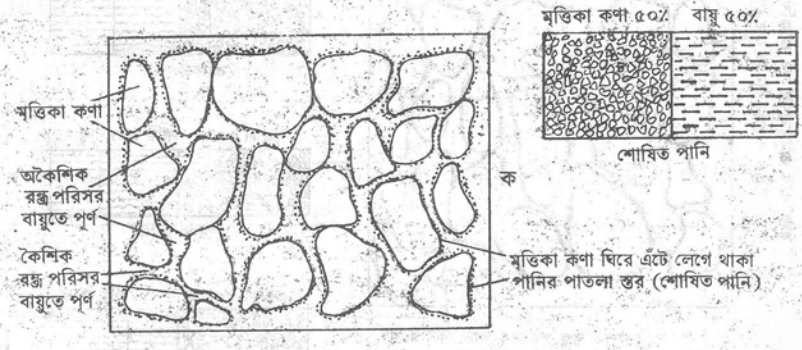


চিত্র ৫ক : শুষ্ক মৃত্তিকা। সব কৈশিক ও অকৈশিক রন্ধ্র পরিসর বায়ুতে পূর্ণ

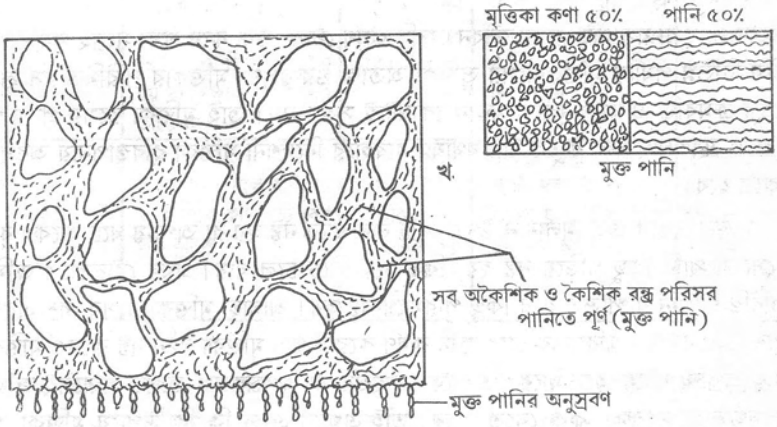


৫খ : অত্যাধিক আর্দ্র মৃত্তিকা। মুক্ত পানি অকৈশিক রন্ধ্র থেকে নিচে চলে যাচ্ছে

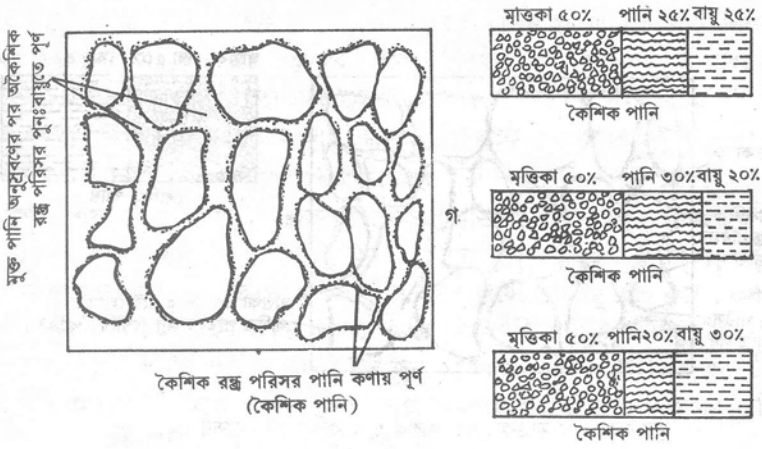


চিত্র ৫গ : সঠিক আর্দ্র মৃত্তিকা। মুক্ত পানি অনুস্রবণের পর কৈশিক রন্ধ্র পরিসরে পানি কণার অবস্থান

## মৃত্তিকা রস সংরক্ষণ

মৃত্তিকা পানি বা রস গাছপালার জীবন। জমি কর্ষণ থেকে শুরু করে শস্য সংগ্রহ পর্যন্ত গাছ বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে মৃত্তিকারসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকার পরিমিত রস ছাড়া গাছের ক্রমবৃদ্ধি ও আশানুরূপে ফলন কোনটাই সম্ভব নয়। তাই মৃত্তিকা রসের প্রাপ্যতা, সংরক্ষণ এবং গাছপালা কর্তৃক এর যথাযথ ব্যবহারে নির্দেশনা মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই থাকতে হবে।

মৃত্তিকা থেকে এই মূল্যবান উপকরণটি নানাভাবে নষ্ট হয় বা অপচয় ঘটে থাকে। বৃষ্টি ও সেচের পানি কিছু গড়িয়ে নষ্ট হয়, কিছু চুয়ে নিচে চলে যায়। প্রখর রৌদ্রতাপে জমির উপরিস্থিত পানি বাষ্পীভূত হয়ে কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়। আগাছা মৃত্তিকা রসের বেশ একটা অংশে ভাগ বসায়। অবিবেচকভাবে জমি কর্ষণ করে অথবা মৃত্তিকা গঠন নষ্ট করেও মৃত্তিকা রসের অপচয় ঘটনো হয়ে থাকে। এভাবে নষ্ট হওয়া বা অপচয় বন্ধ করতে পারলেই জমির রস সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তাই এখানে এখন কি কি উপায়ে মৃত্তিকা রস সংরক্ষণ করা যেতে পারে তা আলোচনা করা হলো—

**(১) জমি সমতলকরণ :** কর্ষণের পর পরই মই দিয়ে জমি সমতল করে রাখা উচিত। তাহলে কর্ষিত আলগা এবং সমতল জমি থেকে সহজে পানি গড়িয়ে যেয়ে নষ্ট হয় না। মৃত্তিকা আলগা থাকার দরুণ এতে পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পায়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে সিঁড়ি চাষ বা

খণ্ড খণ্ড প্লটে চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করে ভূমিক্ষয় রোধ এবং অধিকতর রস সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

## সারণি ৪ : হাতের সাহায্যে মৃত্তিকার রস পরিমাপ পদ্ধতি

| মৃত্তিকার রসের পরিমাণ (পানি ধারণ ক্ষমতার অংশ)% | সূক্ষ্ম বুনটের মৃত্তিকা (এঁটেল মৃত্তিকা, পলি এঁটেল প্রভৃতি) | | মধ্যম থেকে মোটা বুনটের মৃত্তিকা (বেলে অথবা বেলে দোআঁশ প্রভৃতি) | |
|---|---|---|---|---|
| | মৃত্তিকা অবস্থা | করণীয় ব্যবস্থা | মৃত্তিকা অবস্থা | করণীয় ব্যবস্থা |
| ০–২৫ | খুব শুষ্ক | অতিসত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে | খুব শুষ্ক | অতি সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। |
| ২৬–৫০ | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বেঁধে যায় এবং ফেলে দেয়ার সাথে সাথে গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়। | সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। | শুষ্ক, হাতের মুটোয় চাপ দিলে দলা বাঁধে না। | অতি সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। |
| ৫১–৭৫ | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে শক্ত ও কিছুটা আঠালো দলা বাঁধে এবং ফেলে দিলে ভাঙ্গে না। | ২–৩ দিন পর সেচ দিলেও চলবে। | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাঁধে, ফেলে দিলে দলা ভেঙে গুড়োগুড়ো হয়ে যায়। | ১–২ দিন পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। |
| ৭৬–১০০ | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাঁধে এবং তালু ভিজে যায় কিন্তু রস বের হয় না। ফেলে দিলে দলা ভাঙে না। | ৪–৫ দিন পর সেচ দিতে হবে। | হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাঁধে, পানি বের হয় না, কিন্তু ফেলে দিলে দলা ভেঙ্গে যায়। | ২–৩ দিন পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। |
| ১০০ > | কাদা মাটি। হাতের মুঠোয় চাপ দিলে আঙ্গুলর ফাঁক দিয়ে কাদামাটি বের হয়ে আসে। | সেচ দিতে হবে না। অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। | হাতের মুঠায় চাপ দিলে ভেজা দলা বাঁধে, তালু ভিজে যায় কিন্তু পানি বের হয়ে আসে না। | সেচ দিতে হবে না। ৭ দিন পর পুনঃ মাটি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। |

**(২) জৈব সার প্রয়োগ :** জমিতে নিয়মিতভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করা আবশ্যক। এতে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতির ফলে পানি শোষণ এবং পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ মৃত্তিকায় বাষ্পীভূত হয়ে পানি অপচয় হওয়ার সুযোগও কম। জৈবসার প্রয়োগকৃত মৃত্তিকায় রস বেশি দিন সংরক্ষিত থাকে বলে গাছপালা সহজে পানির ভাবে ভোগে না।

**(৩) জাবড়া ব্যবহার :** বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা হতে যে রস নষ্ট হয় এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তা সংরক্ষণ করা যেতে পারে। জাবড়া প্রধানত তিন প্রকার, যথা (ক) মৃত্তিকা জাবড়া (খ) খড়কুটা জাবড়া এবং (গ) কাগজ জাবড়া

**(ক) মৃত্তিকা জাবড়া :** এই পদ্ধতিতে উপরিস্তরের ৫–১০ সে. মি. মৃত্তিকা 'জো' মতো নিড়ি বা আচড়া দিয়ে ঝুরঝুরে করে দেয়া হয়। এতে মৃত্তিকার কৈশিক নালী ভেঙে যায়, ফলে রস আর উপরের দিকে উঠে বাষ্প হয়ে উঠে যেতে পারে না। এভাবে মৃত্তিকার রস সংরক্ষণ করা যায়।

**(খ) খড়কুটা জাবড়া :** খড়কুটা, আবর্জনা ইত্যাদি মৃত্তিকার উপর ছড়িয়ে দিয়ে মৃত্তিকা রস বাষ্পীভবনের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। এ অবস্থায় রস অনেকদিন ধরে সংরক্ষিত থাকে। আদা, আলু, হলুদ, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি ফসলে এ পদ্ধতিতে রস সংরক্ষণের মাধ্যমে আশানুরূপ ফলন লাভ করা যায়। মাঠ শস্যের ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ এলাকায় রস সংরক্ষণে এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়।

**(গ) কাগজ জাবড়া :** এ পদ্ধতিতে ফসলের সারির মধ্যবর্তী জায়গায় কাগজ বিছিয়ে রস সংরক্ষণ করা যেতে পারে। অনেক উন্নত দেশে শাক–সবজি, আনারস, স্ট্র–বেরি প্রভৃতি ফসল উৎপাদনে এ পদ্ধতির বেশ প্রচলন দেখা যায়।

**(৪) আগাছা দমন :** আগাছা মৃত্তিকা থেকে রস শোষণ করে শস্যে রসের অভাব ঘটায়। যে সব আগাছার মূল মৃত্তিকার গভীরে প্রবেশ করে সে সব আগাছা বেশি মাত্রায় রস পরিশোষণ করে। ফসলের জমিতে সব রকম আগাছা সময়মত দমন করে মৃত্তিকা রস অনেকটা সংরক্ষণ করা সম্ভব।

**(৫) শস্য পর্যায় অবলম্বন :** যথাযথ শস্য পর্যায় অনুসরণ করে মৃত্তিকায় অধিকতর রস সংরক্ষণ করা সম্ভব। শস্য পর্যায়ে সারি ফসলের চেয়ে অধিক পরিমাণ ঘাস, শিম এবং সবুজ সারজাতীয় ফসল আবাদ করে মৃত্তিকার ভৌত ধর্ম উন্নতিপূর্বক কার্যকরভাবে জমির রস সংরক্ষণ করা যায়। চাপড়াজাতীয় ফসল মৃত্তিকা ভালভাবে ঢেকে রাখে বলে বাষ্পীভবন হ্রাস পায়, ফলে মৃত্তিকায় অধিক রস ধরে রাখা সম্ভব হয়।

**(৬) সিঁড়ি চাষ বা খণ্ড খণ্ড প্লটে চাষ :** পাহাড়ী ঢালু জমিতে সিঁড়ি অথবা খণ্ড খণ্ড প্লট পদ্ধতিতে শস্য চাষ করে মৃত্তিকা রস অধিকতর কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে গাছ এবং সিঁড়ি দ্বারা পানি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে পানি ঢালু জমিতে প্রবেশের জন্য অধিক সময় পায়।

**(৭) জমি কর্ষণে সাবধানতা অবলম্বন :** জমি কর্ষণ করে অনেক দিন উন্মুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখলে বাষ্পীভবনহেতু জমির রস নষ্ট হয়। তাই কর্ষণ করার পর যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বপন কাজ সেরে ফেলা উচিত। তাছাড়া খুব কুশলতার সাথে অল্প কর্ষণের মাধ্যমে জমি প্রস্তুত করা প্রয়োজন।এতে খরচ এবং মৃত্তিকা রসের অপচয় উভয়ই কম হয়। আমাদের দেশে রবি মৌসুমে মৃত্তিকার রসের খুবই অভাব দেখা যায়। এ সময় যতোটা সম্ভব জমি কম কর্ষণ করে মৃত্তিকাস্থ রস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। মৃত্তিকার এই রস সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে রবি মৌসুমে অনেক ফসল থেকেই আশানুরূপ ফলন লাভ করা সম্ভব।

বরেন্দ্র এলাকায় আমন ধান কাটার পর প্রয়োজনীয় রসের অভাবে এসব জমিতে রবি মৌসুমে খুব কম ফসল আবাদ করা হয়। অথচ মৃত্তিকায় যেটুকু রস অবশিষ্ট (residue moisture) থেকে যায় তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে রবি মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে সরিষা, তিসি, বার্লি, মটর কলাই, ছোলা প্রভৃতি ফসল চাষ করা যেতে পারে। কৃষি গবেষণা সংস্থা কতৃক পরিচালিত একটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বরেন্দ্র এলাকার আমন ধান কাটার পর লাঙ্গল দিয়ে শুধু কিছুটা গভীর নালা তৈরি করে তার মধ্যে সরিষা, বার্লি, মটর কলাই, তিসি প্রভৃতি ফসলের বীজ বপন করে আশানুরূপ ফলন লাভ করা সম্ভব। এরূপ অল্প কর্ষিত জমি থেকে সংরক্ষিত রসের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ০·৭১ টন সরিষা, ১·৫৪ টন বার্লি এবং ১·০০ টন মটর কলাই ফলন পাওয়া যায়। অপর আর একটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, লবণাক্ত মৃত্তিকায় কোনরূপ কর্ষণ ছাড়াই আলু বপন করে খড়কুটো দিয়ে ঢেকে দিলে হেক্টরে ১৫·৭৮ টন আলু পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

# মৃত্তিকা জীব
(Soil Organisms)

মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য জীব ও অণুজীব বসবাস করে। এদের মধ্যে অনেকগুলো বড়, খালি চোখে দেখা যায়। অনেকগুলো আবার এত ছোট যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া চোখে দেখা যায় না। এই ক্ষুদ্রকায় অংশই প্রধানত মৃত্তিকায় বিভিন্ন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে মৃত্তিকার উন্নতি সাধন করে থাকে। মৃত্তিকার মোট বিপাকীয় কার্যক্রমের ৮০–৯০ ভাগ আতি ক্ষুদ্রকায় উদ্ভিদজাতীয় জীবাণু দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই আশানুরূপ ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্তিকায় এমন একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে মৃত্তিকা জীবাণুসমূহ বিশেষ করে উপকারী জীবাণু তাদের ব্যাপক ক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকার অধিকতর উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়। মৃত্তিকায় বসবাসকারী এসব জীব–অণুজীবকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন — (১) প্রাণী এবং (২) উদ্ভিদ।

## প্রাণী

মৃত্তিকায় বসবাসকারী প্রাণীর মধ্যে ইঁদুর, কাঠবিড়াল, কাঁকড়া, কেঁচো, পিঁপড়া, উইপোকা, মাকড়সা, নেমাটোড, রটিফার, প্রোটোজোয়া বিভিন্ন পোকা–মাকড় প্রধান। এইসব প্রাণীর প্রায় সবগুলোই মৃত্তিকার পরিবেশ ও গুণাগুণ নষ্ট করে থাকে। ইঁদুর, বিভিন্ন পোকার কীড়া ধান ও গমের শীষ কেটে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে থাকে। অন্যান্য অনেক পোকার কীড়া পাট, আখ, তুলা, শাক–সবজি ফল–মূল প্রভৃতি ফসলের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। কাঁকড়া, উড়চুঙ্গা এবং বিভিন্ন পোকার কীড়া কচি গোড়া কেটে দেয়। পিঁপড়া, নেমাটোড প্রভৃতিও উদ্ভিদের অনেক ক্ষতি করে। তবে এসব প্রাণী কিছু উপকারও করে থাকে। ইঁদুর, উড়চুঙ্গা, কাকড়া, প্রভৃতি প্রাণী গর্ত করার ফলে মাটির মিশ্রণ ঘটে, মৃত্তিকায় পানি ও বায়ু চলাচল সহজ হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব প্রাণী মৃত্তিকা কণার দানাগঠনেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। তবে প্রাণীদের মধ্যে কেঁচো মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে ফসল উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

**কেঁচো :** সব প্রকার মৃত্তিকাতেই কম–বেশি কেঁচো দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি আর্দ্র বালিতেও কিছু কিছু কেঁচো বসবাস করে। তবে প্রচুর জৈব পদার্থযুক্ত ভারী, কাদাজাতীয় আর্দ্র কিন্তু ভালভাবে বায়ু চালাচল করে এমন মৃত্তিকা এদের বাসস্থানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। দ্রুত বংশবিস্তারের জন্য কেঁচোর বিভিন্ন প্রজাতির তাপমাত্র বিভিন্ন। তবে ১০ থেকে ৩২° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এরা বেশ সক্রিয় থাকে। $P^H$ মান ৫ থেকে ৮ এর মধ্যে এদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে।

কেঁচো নানাভাবে মৃত্তিকায় উর্বরতা বৃদ্ধি করে থাকে। সাধারণত উপরিস্তরের ১৫–২৫ সে. মি. এর মধ্যে এদের কর্ম-কাণ্ড মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতিতে বেশ সহায়ক। এদের লম্বা দেহের ভেতর থেকে মলরূপে যে নরম, দানাদার মৃত্তিকা বের হয়ে আসে তা বেশ মোলায়েম ও সূক্ষ্ম দানাযুক্ত হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে, অনুকূল পরিবেশে এক হেক্টর আবাদী জমিতে কেঁচো বছরে প্রায় ১৮ টন মল ত্যাগ করে। এই মল আশেপাশের সাধারণ মৃত্তিকার চেয়ে অধিক পরিমাণ জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ফসফরাস ও পটাশসমৃদ্ধ। একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সাধারণ মৃত্তিকায় যেখানে ২২.২ ভাগ পলি ও কাদা এবং ০.১২ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে, সেক্ষেত্রে কেঁচোর মলে এদের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮.৮ এবং ০.৩৩ ভাগ। কেঁচোর মলে ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা সাধারণ মৃত্তিকার প্রায় ৪ গুণের কাছাকাছি। কেঁচোর এই মৃত্তিকা যে উর্বর তা এর আশে-পাশের সতেজ ও সবল গাছপালা দেখেই বুঝতে পারা যায়। এছাড়া কেঁচো আরো নানাভাবে চাষের জমির উন্নতি সাধন করে থাকে। মৃত্তিকার নিচে যেসব সরুপথে এরা চলাচল করে সেসব পথে বায়ু ও পানি চলাচল সহজতর হয়। মৃত্তিকার নিচের অতিরিক্ত পানিও এইসব ছিদ্রপথে সহজে নিষ্কাশিত হতে পারে। কেঁচোর চলাচলে উপর ও নিচ মৃত্তিকা কণার মিশ্রণ ঘটে ফলে এর ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থারও উন্নতি হয়।

কেঁচো মৃত্তিকা উন্নয়নকারী একটি অতি উপকারী প্রাণী। তাই চাষের জমিতে যাতে অধিক সংখ্যক কেঁচো থাকতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে মৃত্তিকার যত্ন নেয়া উচিত। খামারজাত সার অথবা যে কোনো জৈব পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করলে কেঁচোর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকায় রস একটু বেশি থাকলে কেচোঁর বংশবৃদ্ধি সহজতর হয়। অনুকূল পরিবেশে প্রতি হেক্টরে ১০ লক্ষ পর্যন্ত কেঁচো দেখা যায়।

**উইপোকা :** উইপোকা মৃত্তিকায় বাসকারী আর একটি ক্ষুদ্র প্রাণী। এদের পরিত্যক্ত মৃত্তিকা কেঁচোর মতো উর্বর নয়। এই মৃত্তিকা শুকালে এতো শক্ত ও চাপ বেঁধে যায় যে গাছপালা এতে মোটেই ভালভাবে জন্মাতে পারে না। এই মৃত্তিকায় জৈব পদার্থও খুব কম; তবে উইপোকা জৈব পদার্থের আঁশজাতীয় অংশ বিযোজনে কার্যকরী। এটি সাধারণত গাছপালা ও ঘরবাড়ির ক্ষতি সাধ ন করে থাকে।

**নেমাটোড :** মৃত্তিকায় বসবাসকারী এটি একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রাণী। এটি সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না। কৃমিজাতীয় এই প্রাণী বিভিন্ন শাক-সবজি, তুলা প্রভৃতি ফসলের শিকড় আক্রমণ করে গাছপালার বেশ ক্ষতি সাধন করে থাকে।

### উদ্ভিদ

মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি সাধনে মৃত্তিকাস্থ প্রাণীর চেয়ে উদ্ভিদের গুরুত্ব অনেক বেশি। গাছপালার আশানুরূপ বৃদ্ধি এবং ফলন লাভের জন্য মৃত্তিকায় যেরূপ পরিবেশের দরকার নিম্নগোত্রীয় উদ্ভিদ সেই পরিবেশের প্রায় সবটাই সৃষ্টি করে থাকে। এই সমস্ত নিম্নগোত্রীয়

উদ্ভিদকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা— (১) শৈবাল, (২) ছত্রাক, (৩) অ্যাকটিনোমাইসেটিস এবং (৪) ব্যাকটেরিয়া।

(১) **শৈবাল :** অধিকাংশ শৈবাল বা শেওলার দেহে সবুজ কণিকা বিদ্যমান বলে এদের সবুজ দেখায়। এই সবুজ কণিকার উপস্থিতির কারণে উচ্চগোত্রের উদ্ভিদের মতো এরা নিজেরাই খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম। খাবার প্রস্তুত করতে আলোর দরকার বলে এই শেওলার প্রায় সব প্রজাতি আর্দ্র মৃত্তিকার উপরিভাগে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এদের কোনো কোনো প্রজাতি মৃত্তিকা অভ্যন্তরে বসবাস করে এবং জৈব পদার্থের পচন ঘটিয়ে খাদ্য ও শক্তি সংগ্রহ করে থাকে। কয়েক শত প্রজাতির শেওলা মৃত্তিকায় দেখতে পাওয়া যায়। এদের প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—(ক) নীলাভ-সবুজ (Blue-green), (খ) সবুজ (Green), (গ) হলদে-সবুজ (Yellow-Green) এবং (ঘ) ডায়াটম (Diatom)। এদের মধ্যে ঈষৎ অম্ল মৃত্তিকায় সবুজ শেওলা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। খামারজাত সার এদের দ্রুত বংশবৃদ্ধিতে সহায়ক।

নীলাভ-সবুজ জাতের শেওলাই কৃষি জমিতে বিশেষ উপকার সাধন করে থাকে। রোপা ধানের জমিতে পানির উপর ভাসমান নীলাভ-সবুজ শেওলা সূর্যের আলোর সাহায্যে বায়ুমণ্ডল থেকে নিজে দেহে বেশ পরিমাণ নাইট্রোজেন ধরে রাখতে সক্ষম। এদের জীবনচক্র শেষে একদিকে যেমন জমিতে জৈব পদার্থ যোগ হয়, অন্যদিকে ধানগাছ বাড়তি নাইট্রোজেন পেয়ে থাকে। এই শেওলা *Azolla* নামক একপ্রকার জলজ ফার্নের পাতায় জন্মেও বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন আহরণ করতে পারে যা পরবর্তীতে ধান গাছের কাজে লাগে। এটি হেক্টরে প্রতি বছরে প্রায় ১০-৫০ কেজি নাইট্রোজেন আহরণ করতে সক্ষম। এই শেওলা উঁচু জমির ধানেও বায়ুমণ্ডল থেকে কিঞ্চিত পরিমাণ নাইট্রোজেন মৃত্তিকায় যোগ করতে পারে। ধান রোপণের ১০-১৫ দিন পর জমিতে ৪-৫ সে.মি. পানি থাকা অবস্থায় *Azolla* ছিটিয়ে দিতে হয়। অনুকূল পরিবেশে ১০-১৫ দিনের মধ্যে এগুলো বেড়ে পানির উপরে একটি আস্তর তৈরি করে। এ সময় জমিতে অল্প পানি থাকা অবস্থায় *Azolla* মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। এভাবে ধান রোপণ থেকে শুরু করে অন্তত দু'বার আস্তর তৈরি করে *Azolla* মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে। *Azolla*-র দ্রুত বৃদ্ধির জন্য হেক্টরে প্রায় ১০ কেজি সুপার ফসফেট সার জমিতে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ধানের সম্ভাব্য ফলন ব্যাহত না করে *Azolla* প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতি হেক্টরে ৪০ কেজি নাইট্রোজেন সাশ্রয় করা সম্ভব।

(২) **ছত্রাক :** ছত্রাক ছাতাজাতীয় উদ্ভিদ নামেও পরিচিত। এদের দেহে কোনো সবুজ কণিকা নেই, তাই এরা নিজেরা কোনো খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। জৈব পদার্থ থেকে অবমুক্ত শক্তি এবং কার্বনের উপর এদের জীবন ধারণ নির্ভর করে। ছত্রাককে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা — (ক) ইস্ট (Yeasts) (খ) মোল্ড (Molds) এবং (গ) মাশরুম (Mushroom)। মোল্ড এবং মাশরুম ছত্রাকই মৃত্তিকায় বেশি পরিমাণে দেখা যায়। মৃত্তিকায় ইস্টের সংখ্যা কম।

অধিকাংশ ছত্রাকই খালি চোখে দেখা যায় না। এরা সাধারণত মৃত্তিকার উপরিভাগে বাস করে যেখানে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ বিদ্যমান এবং বায়ু চলাচলও বেশি। এরা জৈব পদার্থ বিযোজনে ব্যাকটেরিয়া ও অ্যাকটিনোমাইসেটিসের চেয়েও অধিকতর কার্যকর। টাটকা জৈব পদার্থের অপেক্ষাকৃত শক্ত অংশ যার উপর র‍্যাকটেরিয়া বা অ্যাকটিনোমাইসেটিস কাজ করতে পারে না, সেখানে ছত্রাক এসব শক্ত অংশ পচিয়ে হিউমাসে পরিণত করে। অম্ল মৃত্তিকায় ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থের বিযোজন প্রক্রিয়ায় তেমন কার্যকর নয়, সেখানেও ছত্রাক জৈব পদার্থের বিযোজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

অনেক ছত্রাক আবার গাছপালা ও শস্যের বিভিন্ন ক্ষতি সাধন করে থাকে। শস্যের গোড়া পচা, পাতা পচা, পাতায় দাগ, কাণ্ড পচা, ঝিমিয়ে পড়া প্রভৃতি রোগ বিভিন্ন ছত্রাকের আক্রমণের ফলেই সংঘটিত হয়ে থাকে। অবশ্য এক জাতের ছত্রাক (Hymenocytes) গাছপালার উপকার করে থাকে। এরা গাছের শিকড়ে বাস করে মৃত্তিকা থেকে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান, যেমন — ফসফরাস, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা ইত্যাদি অধিক পরিমাণে আহরণ করতে গাছকে সাহায্য করে। এর বিনিময়ে গাছপালাও এদের জন্য শর্করা এবং কিছু জৈব রস খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করে থাকে উদ্ভিদ এবং ছত্রাকের এরূপ পরস্পর উপকারী বসবাসকে মাইকোরিজা (Mycorhiza) বলা হয়।

(৩) **অ্যাকটিনোমাইসেটিস :** এটি ব্যাকটেরিয়ার মতো ক্ষুদ্র এককোষী উদ্ভিদ। আর্দ্র এবং পর্যাপ্ত বায়ু চালাচল করে এমন মৃত্তিকা এদের বসবাসের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। খরার সময় যখন ব্যাকটেরিয়া বা মোল্ডের কার্যক্রম থেমে যায়, সে সময়ও এরা ক্রিয়া চালিয়ে যেতে সক্ষম। অম্ল মৃত্তিকায় এরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই এরা যখন আলুতে "Potato scab" রোগের সৃষ্টি করে তখন মৃত্তিকায় অম্লত্ব বৃদ্ধি করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

আর্দ্র, পর্যাপ্ত জৈবপদার্থ সম্বলিত এবং কিঞ্চিত ক্ষারজাতীয় মৃত্তিকায় এদের প্রচুর বংশবৃদ্ধি ঘটে। এরা জৈব পদার্থ বিযোজনে খুবই দক্ষ এবং বিযোজনকালে অনেক পুষ্টি উপাদান বিমুক্ত হয়ে উদ্ভিদের জন্য লভ্য হয়। সেলুলোজ, কাইটিন এবং ফসফোলিপিড বিযোজনে এদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) **ব্যাকটেরিয়া :** ব্যাকটেরিয়া অতি ক্ষুদ্রকায় এককোষী উদ্ভিদ। এদের দেহের গঠন খুবই সহজ। দেহে কোনো সবুজ কণিকা না থাকার দরুণ এরা নিজেরা খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। এরা গোল, লম্বা, স্ক্রু বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। মৃত্তিকায় লম্বা জাতের ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাই বেশি। ব্যাকটেরিয়া এতো ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। লম্বাকৃতি সবচেয়ে বড় একটি ব্যাকটেরিয়ার দৈর্ঘ্য ০·০০৪—০·০০৫ সে.মি. এর বেশি নয় এবং সবচেয়ে ছোটগুলো কর্দম কণার চেয়েও ছোট হতে পারে।

সাধারণত মৃত্তিকায় উপরিস্তরে এদের সংখ্যা বেশি কারণ এই স্তরের তাপমাত্রা, বায়ুচলাচল, আর্দ্রতা এবং পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ এদের বসবাস এবং বংশবৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এরূপ অনুকূল পরিবেশে এক কেজি মৃত্তিকায় এদের সংখ্যা ২০–৩০ লক্ষ থেকে কয়েক কোটি পর্যন্ত হতে পারে। এরা মৃত্তিকা কণা ঘিরে দল বেঁধে বাস করে।

ব্যাকটেরিয়া অটোট্রফিক অথবা হেটোরোট্রফিক জাতের হতে পারে। অটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া ধাতব পদার্থ, যেমন—সালফার, আয়রন, অ্যামোনিয়াম, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতির জারণ প্রক্রিয়ায় শক্তি আহরণ করে থাকে। এরা সংখ্যায় কম। হেটোরোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া মৃত্তিকায় অনেক বেশি। এরা জৈব পদার্থের বিযোজন প্রক্রিয়ায় শক্তি ও খাদ্য আহরণ করে থাকে। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন, কোনটার জন্য আবার অক্সিজেনের কোনো প্রয়োজন নেই। ২১ থেকে ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৬–৮ $P^H$ মান ব্যাকটেরিয়ার জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

কৃষি জমিতে ফসল উৎপাদনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যাকটেরিয়ার দান ব্যাপক এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় টাটকা জৈব পদার্থ বিযোজনকালে যেসব পুষ্টি যেমন—কার্বন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি অবমুক্ত হয় তা উদ্ভিদ গ্রহণ করে তাদের স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। এছাড়া উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অতীব প্রয়োজনীয় অ্যামোনিফিকেশন, নাইট্রিফিকেশন, নাইট্রোজেন ফিক্সেশন, সালফার অক্সিডেশন বিভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই মৃত্তিকাস্থ বিভিন্ন জীব-অণুজীবের বংশবৃদ্ধি ও কার্যক্রম সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বিভিন্ন জাতের ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণীজ প্রোটিন আক্সিজেনের সাহায্যে দাহ্য করে উদ্ভিদের জন্য লভ্য নাইট্রোজনে রূপান্তরিত করে। প্রথম ধাপে অ্যামোনিফিকেশন এবং দ্বিতীয় ধাপে নাইট্রেফিকেশন প্রক্রিয়ায় এই রূপান্তর সম্পন্ন হয়।

**অ্যামোনিফিকেশন** (Ammonification) : এই প্রক্রিয়ায় প্রোটিন বিভিন্ন প্রকার জীবাণু, যেমন—ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এ্যামোনিয়ামে পরিবর্তিত হয়—

$$\text{প্রোটিন} \xrightarrow[\text{ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের সাহায্যে}]{\text{এনজাইমিক অক্সিডেশন}} NH_4$$

**নাইট্রিফিকেশন** (Nitrification) : এই প্রক্রিয়ায় নাইট্রোসোমোনাস এবং নাইট্রোকক্সাস ব্যাকটেরিয়া প্রথমে অ্যামোনিয়ামকে নাইট্রাইট নাইট্রোজেনে ($NO_2$) এবং নাইট্রোব্যাক্টর ব্যাকটেরিয়া পরবর্তীতে নাইট্রাইট নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট নাইট্রোজেনে ($NO_3$) রূপান্তর করে। মৃত্তিকার ২৬° থেকে ৩২° সেলসিয়ায় তাপমাত্রা, পরিমিত রস, নাইট্রোজেন এবং বায়ু ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া তরান্বিত করে থাকে। নিচে বিভিন্ন ধাপ দেখানো হলো—

$$NH_4 + O_2 \xrightarrow[\text{Nitrosomonas এবং Nitrosococcus ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে}]{\text{এনজাইমিক অক্সিডেশন}} NO_2 + H_2O + H + \text{শক্তি}$$

$$NO_2 + O_2 \xrightarrow[\text{Nitrobacter ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে}]{\text{এনজাইমিক অক্সিডেশন}} NO_3 + \text{শক্তি}$$

শেষ ধাপে, সৃষ্ট নাইট্রেট নাইট্রোজেনই ফসলের জন্য সহজলভ্য। ধান গাছ অবশ্য অ্যামোনিয়াম হিসেবেও নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে সক্ষম। নাইট্রেট নাইট্রোজেন মৃত্তিকা পানিতে দ্রুত দ্রবণীয়। রাসায়নিক সার ইউরিয়া, অ্যামেনিয়াম সালফেট প্রভৃতি নাইট্রেট নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হওয়ার পর মৃত্তিকার রসে দ্রুত দ্রবীভূত হয়ে নিচে চলে যায়। তাই জমিতে শস্য থাকা অবস্থায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা উচিত। যে সব ফসলের বীজ দ্রুত অর্থাৎ ৪–৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম হয় সে সব ফসলের ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তি নাইট্রোজেন সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে সাথে সাথে বীজ বপন করা যেতে পারে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে সারিতে বপনকৃত ফসলের ক্ষেত্রে সারিতে সার প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে বীজ বপন করলে সারের কার্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত ব্যাকটেরিয়াসমূহ কৃষি জমিতে যাতে কার্যক্ষম থাকতে পারে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। মৃত্তিকায় উপযুক্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ, পানি, বায়ু ও তাপ বিদ্যমান থাকলে এসব ব্যাকটেরিয়া অধিকতর সক্রিয় থাকে। অম্লাত্বক মৃত্তিকায় এদের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই মৃত্তিকা অম্ল হলে চুন প্রয়োগ করে $P^H$ মান ৬ থেকে ৮ এর মধ্যে রাখা বাঞ্ছনীয়। চুন প্রয়োগে দানাবন্ধনও উন্নততর হয় ফলে মৃত্তিকা অভ্যন্তরে বায়ু ও পানি চালাচলের সুবিধা হওয়ায় এসব ব্যাকটেরিয়ার কার্যক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকা মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দিলে বা জাবড়া প্রয়োগ করলেও ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। চেপে যাওয়া এবং জলাবদ্ধ মৃত্তিকায় অক্সিজেনের অভাবহেতু এসব উপকারী ব্যাকটেরিয়ার কার্যক্রম ভীষণভাবে ব্যহত হয় এবং এরূপ পরিবেশে ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া (Denitrifying bacteria) সক্রিয় হবার ফলে লভ্য নাইট্রেট নাইট্রোজেন প্রথমে নাইট্রাইট নাইট্রোজেন এবং পরবর্তীতে গ্যাসীয় নাইট্রোজেনরূপে মৃত্তিকা থেকে বের হয়ে যায়। জমির উর্বরতার দিক থেকে ইহা একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রক্রিয়া। এরূপ প্রক্রিয়া যাতে ফসলের জমিতে সংঘটিত না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রেখে মৃত্তিকার যত্ন নেয়া দরকার।

**নাইট্রোজেন সংবন্ধন** (Nitrogen fixation) : নাইট্রোজেন উদ্ভিদের একটি অন্যতম প্রধান এবং অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন বিদ্যমান, কিন্তু এই গ্যাসীয় নাইট্রোজেন উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু মৃত্তিকাস্থ তিন জাতের ব্যাকটেরিয়া— *Rhizobium*, *Azotobacter* এবং *Clostridium* বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি ধাতব নাইট্রোজেন আহরণ করতে সক্ষম। পরবর্তীকালে মৃত্তিকায় সঞ্চিত এই নাইট্রোজেন ফসলাদি গ্রহণ করতে পারে। কোন্ জাতের ব্যাকটেরিয়া কিভাবে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সংবদ্ধ করে তা নিচে আলোচনা করা হলো—

সিমবায়োটিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন (Symbiotic N. Fixation) : শিমজাতীয় গাছ, যেমন—ধইঞ্চা, শন, সয়াবিন, কাউপি, চীনাবাদাম, খেশারি, মাশকলাই প্রভৃতি যখন জমিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন *Rhizebium* জাতের ব্যাকটেরিয়া মূলরোমের ভিতর দিয়ে গাছের শিকড়ে প্রবেশ করে। ব্যাকটেরিয়ার এরূপ অনুপ্রবেশের ফলে শিকড়ের কোনো কোনো স্থান ধীরে ধীরে ফুলে উঠে এবং ছোট–বড় গুটিতে পরিণত হয়। বাড়ন্ত একটি ধইঞ্চা বা চীনা–

বাদাম গাছ মৃত্তিকা থেকে টেনে তুললে শিকড়ের নানাস্থানে অসংখ্য গুটি দেখা যায়। এইসব গুটির মধ্যেই *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়া বাস করে এবং বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন এই গুটির মধ্যে সঞ্চয় করে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে ব্যাকটেরিয়া গাছ থেকে কার্বনজাতীয় পুষ্টি পায় এবং বিনিময়ে গুটিতে সঞ্চিত নাইট্রোজেন গাছ গ্রহণ করে থাকে। এরূপ খাদ্য আদান-প্রদানের ফলে গাছ ও ব্যাকটেরিয়া উভয়েই উপকৃত হয়। পরস্পরের জন্য উপকারী এরূপ জীবন ধারণকে সিমবায়োসিস (Symbiosis) বলা হয়।

শিমজাতীয় গাছের বাড়ন্তকালে শিকড় থেকে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন মৃত্তিকায় চলে আসে, ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা তখন থেকেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তী সময়ে গাছের গোড়া যখন কর্ষণের মাধ্যমে মৃত্তিকায় মিশিয়ে দেয়া হয়, তখন শিকড়ের গুটিমধ্যস্থিত নাইট্রোজেন মৃত্তিকায় মিশে গিয়ে এর নাইট্রোজেনের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয়। এর উপর ভিত্তি করেই কৃষি জমিতে শিমজাতীয় গাছ সবুজ-সার হিসেবে চাষ করে জমিতে জৈব পদার্থ যোগসহ কিছু বাড়তি নাইট্রোজেনও সংযোজন করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়। সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পরিমাণমতো বায়ু ও পানি চলাচল, পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ এবং ফসফরাস, পটাসিয়াম, সালফার ও ক্যালসিয়ামের উপস্থিতি সিমবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার বংশ ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ফলে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সংযোজনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া মলিবডেনাম, বোরন, কোবাল্ট এবং লোহার উপস্থিতিও নাইট্রোজেন ফিক্সেশনে সহায়ক বলে মনে করা হয়।

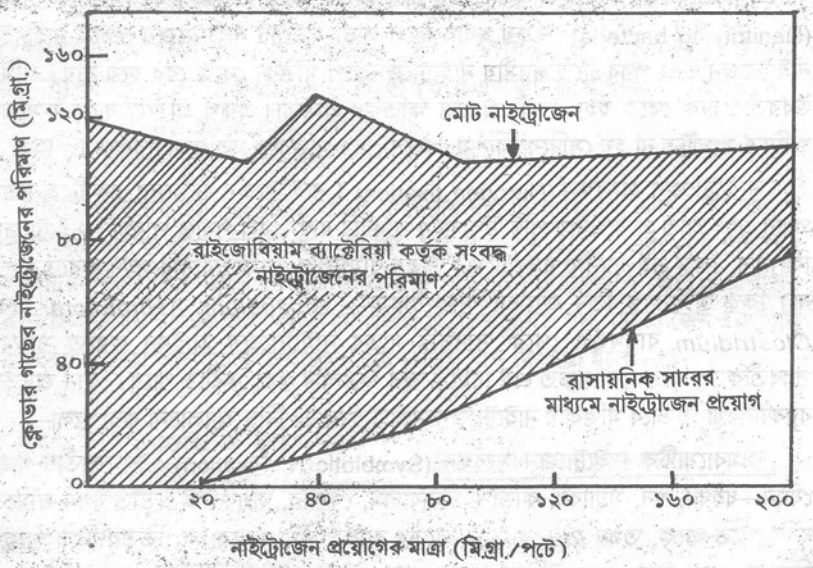


চিত্র ৬ : বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের উপর মৃত্তিকায় বিদ্যমান নাইট্রোজেনের প্রভাব।

পক্ষান্তরে মৃত্তিকায় যদি পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন মজুদ থাকে অথবা বাইরে থেকে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হয়, তাহলে নাইট্রোজেন ফিক্সেশনের হার হ্রাস পায় (চিত্র ৬)। চিত্রে দেখা যায় যে, মৃত্তিকায় যতো বেশি নাইট্রোজেন বাইরে থেকে সংযোজন করা হয় মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ ততো বেশি কমে যায়। যখন একটি পটে ৪০ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হয়, তখন ক্লোভার গাছে প্রায় ১২০ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন পাওয়া যায়, পক্ষান্তরে পটে ২০০ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন প্রয়োগ করে খুব কম নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। তাই মৃত্তিকায় শিমজাতীয় গাছ উৎপাদনকালে বাইরে থেকে নাইট্রোজেন প্রয়োগ বুদ্ধিমত্তার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার শিমজাতীয় গাছ মৃত্তিকায় বিভিন্ন পরিমাণে নাইট্রোজেন যোগ করে থাকে। আলফালফা অন্যান্য শিমজাতীয় গাছের তুলনায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ নাইট্রোজেন মৃত্তিকায় যোগ করে। দশ বছর স্থায়ী একটি পরীক্ষায় বিভিন্ন শিমজাতীয় গাছকে প্রতিবছর হেক্টরে নিম্নলিখিত নাইট্রোজেন যোগ করতে দেখা গেছে—

| গাছের নাম | নাইট্রোজেনের পরিমাণ (হেক্টরে) |
|---|---|
| আলফালফা | ১৫০–২৫০ কেজি |
| সুইট ক্লোভার | ১০০–১৫০ ” |
| সয়াবিন | ৫০–১৫০ ” |
| গোমটর | ৫০–১০০ ” |

বর্তমানে বিশেষ জাতের কৃত্রিম ইনোকুলাম বিশেষ করে শিমজাতীয় গাছের শিকড়ে গুটি সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য বাজারে পাওয়া যায়। এসব ইনোকুলাম বীজের সাথে মিশিয়ে অথবা মৃত্তিকায় প্রয়োগ করে শিকড়ে গুটি তথা মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।

কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে, শিমজাতীয় গাছ জন্মিয়েও জমিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায় না। দুটি কারণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, জমিতে যদি ইতোমধ্যেই নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকে অথবা বাইরে থেকে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ব্যাকটেরিয়া বায়ুমণ্ডল থেকে আর কোন নাইট্রোজেন যোগ করে না। কারণ নাইট্রোজেন সংযোজনের পরিমাণ মোট প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল (চিত্র ৬)। দ্বিতীয়ত, শিমজাতীয় ফসল যদি জমি থেকে সংগ্রহের সময় শিকড়সহ টেনে তোলা হয়, তাহলে শিকড়ের সাথে সাথে গুটিও উঠে আসে ফলে ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক বায়ুমণ্ডল থেকে সংবদ্ধ নাইট্রোজেন মৃত্তিকায় সংযোজন না হয়ে অন্যভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এই শেষোক্ত কারণই আমাদের দেশে সবচেয়ে মারাত্মক। কারণ জমিতে খুব অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা হয়, তদুপরি শিমজাতীয় গাছ যদি শিকড়সহ টেনে তোলা হয় তাহলে মৃত্তিকার আর কোন নাইট্রোজেন অবশিষ্ট থাকল না, ফলে এরূপ জমি থেকে ভাল ফলন লাভের আশা বৃথা। আমাদের দেশের কৃষক অজ্ঞতার কারণে এমন কাজটি নিয়মিত করে চলেছে। খেশারি, মাশকলাই, মটরশুটি, মশুর, ছোলা প্রভৃতি শিমজাতীয় ফসল পরিপক্ব হওয়ার পর গুটিসহ টেনে তুলে নিজেরাই জমির উর্বরতার অশেষ ক্ষতি সাধন করছে। তাই এরূপ কাজ আর না করে কাস্তের সাহায্যে গোড়া কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হবে, এতে যেমন মৃত্তিকায়

নাইট্রোজেন সংযোজন হবে অন্যদিকে তেমনি জৈব পদার্থ যোগ হয়ে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতি হবে।

শিমজাতীয় গাছ ছাড়াও প্রায় ১৬০টি প্রজাতির অশিমজাতীয় গাছ সিমবায়োটিক প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সংযোজন করতে সক্ষম। এর মধ্যে আবৃতবীজী (Angiosperms) গোত্র উল্লেখযোগ্য। সাধারণত বনাঞ্চলে এ গোত্রের বৃক্ষের শিকড়ে এরূপ সিমবায়োটিক প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মেঠো ফসলে এরূপ প্রক্রিয়া দেখা যায় না।

**নন্-সিমবায়োটিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন** (Non-Symbiotic nitrogen fixation) : *Azotobacter* এবং *Clostridium* নামক দু'জাতের ব্যাকটেরিয়া গাছের সহচার্য ছাড়াই বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন যোগ করতে পারে। এরূপ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সলযোজনকে নন্-সিমবায়োটিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলে। *Azotobactor* অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এবং *Clostridium* অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এরূপ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ, পরিমিত রস ও তাপমাত্রা এদের কার্যক্রমে সহায়ক। ফলে এরূপ মৃত্তিকায় অধিক নাইট্রোজেন সংযোজন হয়। *Azotobacter* $P^H$ মান ৬ এর কম নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। অন্যদিকে $P^H$ মান কম-বেশির জন্য *Clostridium* কার্যক্রম তেমন বিঘ্নিত হয় না। সাধারণভাবে এদের দ্বারা মৃত্তিকায় সংযোজনকৃত নাইট্রোজেনের পরিমাণ তেমন বেশি নয়, হেক্টর প্রতি বছরে প্রায় ৫-২০ কেজি।

**সালফার অক্সিডেশন** (Sulfur Oxidation) : উদ্ভিদ মৃত্তিকা থেকে সালফার সাধারণত $SO_4$ = আয়ন হিসেবে শোষণ করে থাকে। কিন্তু কিছু পরিমাণ সালফার $SO_2$ হিসেবেও পাতার ভিতর দিয়ে গৃহীত হয়ে থাকে। অনুকূল পরিবেশে থায়োব্যাসিলাস গোত্রের ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক বিযোজনকালে জারন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বা প্রাণিজ জৈব পদার্থ $SO_4^=$ আয়নে রূপান্তরিত হয় যা পরবর্তীতে গাছে গ্রহণ করে অথবা দ্রবীভূত হয়ে নিচে চলে যায়। এ সময় কিছু সালফার $SO_2$ হিসেবে বায়ুমণ্ডলে চলে যেতে পারে। সালফার অক্সিডেশন কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয় —

জৈব সালফার ----------→ Decay Products ----------→ $SO_4^= + H^+$
(প্রোটিন ও অন্যান্য জৈবযৌগ) ($H_2S$ এবং অন্যান্য সালফাইড) (সালফেট)

জলাবদ্ধ মৃত্তিকায় অক্সিজেনের অভাবহেতু অন্য গোত্রের ব্যাকটেরিয়া, যেমন— ডিসালফোভিব্রায়ো (Dulsulfovibrio) এবং ডিসালফোটোম্যাকুলাম (Desulfotomaculum) লভ্য সালফারকে ($SO_4^=$) সালফাইডে ($S^=$) রূপান্তরিত করে উদ্ভিদের জন্য অলভ্য করে তোলে।

মৃত্তিকাস্থ সমস্ত ব্যাকটেরিয়াই যে গাছপালায় বা ফসলের উপকার করে এমন কিন্তু ঠিক নয়। ফসলের বিভিন্ন রোগ, যেমন— ধানের ঝলসে যাওয়া রোগ, টমেটোর ঢলেপড়া রোগ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক সংঘটিত হয়ে থাকে।

বর্তমানে ফসলে যথেচ্ছ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকা অণুজীব এবং ভৌত ধর্মের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তাই কীটনাশক ব্যবহারে সংযমী হওয়া উচিত। সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা এ ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

# মৃত্তিকা উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা
(Soil Fertility & Productivity)

মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিবেচ্য বিষয় হলো ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা। যে কোনো ফসল উৎপাদনে মৃত্তিকার বিভিন্ন পরিচর্যা এমন কুশলতার সাথে করতে হবে যেন মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্বরতা রক্ষার মাধ্যমে শস্য থেকে আশানুরূপ ফলন লাভ করা যায় অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থাপনার সমুদয় কর্মকাণ্ড এই দুটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

**মৃত্তিকা উর্বরতা :** উদ্ভিদ বা শস্যের জন্য মৃত্তিকাতে যথাযথ পরিমাণে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতিকে মৃত্তিকার উর্বরতা বলা হয়। মৃত্তিকার উর্বরতা দু' প্রকার : যথা — (১) প্রকৃতিক উর্বরতা এবং (২) অর্জিত উর্বরতা

**(১) প্রাকৃতিক উর্বরতা :** প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সম্পন্ন প্রাকৃতিক শিলা–পাথর অথবা কোনো জৈব বা অজৈব পদার্থ থেকে সময়ের ব্যবধানে সৃষ্ট মৃত্তিকাকে প্রাকৃতিক উর্বরতা সম্পন্ন মৃত্তিকা বলা হয়। উৎস বস্তুর গুণাগুণের উপরই মৃত্তিকার উর্বরতা নির্ভরশীল।

**(২) অর্জিত উর্বরতা :** মৃত্তিকা যখন বিভিন্ন কৌশল এবং পরিচর্যার মাধ্যমে উর্বর করা হয় তখন তাকে অর্জিত উর্বর মৃত্তিকা বলা হয়। কর্ষণ কৌশল, জৈব পদার্থ প্রয়োগ, অম্লমান নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।

**মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা :** কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার অধীন অনুকূল পরিবেশে উর্বর মৃত্তিকা থেকে একটি শস্যের বাঞ্ছিত ফলনদানের উপযুক্ততাকে মৃত্তিকার উৎপাদনক্ষমতা বলে। মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা এক নয়। একখানি ফসলের জমি উর্বর হতে পারে, কিন্তু উৎপাদনক্ষম নাও হতে পারে। কারণ মৃত্তিকার উৎপাদনক্ষমতা এর উর্বরতা ছাড়া আরও অনেকগুলো নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন— ফসলে পোকা ও রোগ–বালাইয়ের আক্রমণ, আগাছার উপদ্রব, পানির অভাব ইত্যাদি। একখানি জমি উর্বর অর্থাৎ এতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ এবং অন্যান্য পুষ্টি বিদ্যমান কিন্তু জমিতে রসের অভাবে এসব পুষ্টি উপাদান গাছের কোনো কাজে আসে না ফলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ জমিটি উর্বর হওয়া সত্ত্বেও রসের অভাবহেতু উৎপাদনক্ষম নয়। এখানে মৃত্তিকারস শস্যের ফলনে সীমিত কারণ (limiting factor) হিসেবে কাজ করছে। গাছের বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য অন্যান্য সব কিছু বিদ্যমান থাকলেও শুধু

পানি বা মৃত্তিকারস এখানে ফসলের ফলন সীমিত করেছে। তদরূপ রোগ-বালাই, পোকা-মাকড় প্রভৃতিও কোনো কোনো সময় উর্বর জমিতে জন্মানো ফসলে সীমিত কারণ হিসেবে কাজ করে, ফলে ফলন ব্যাহত হয়। নিচের ছকে মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো—

**মৃত্তিকা উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতার পার্থক্য**

| উর্বরতা | উৎপাদনক্ষমতা |
|---|---|
| ১। মৃত্তিকার উর্বরতা একটি মৌলিক গুণ যা কেবল পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। | ১। একাধিক উপাদান যেমন—জলবায়ু, পোকা-মাকড়, পানি, পুষ্টি উপাদান ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট গুণ যা ফলন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। |
| ২। সকল উর্বর মৃত্তিকা প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদনক্ষম নাও হতে পারে। | ২। সকল উৎপাদনক্ষম মৃত্তিকা অবশ্যই উর্বর। |
| ৩। পুষ্টি উপাদানের উপস্থিতি দ্বারা অধিক নিয়ন্ত্রিত হয়। | ৩। আবহাওয়া ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা অধিক নিয়ন্ত্রিত হয়। |
| ৪। সঠিক মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উর্বরতা বাড়ানো সম্ভব। | ৪। সঠিক ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব। |
| ৫। উর্বরতা একটি প্রচ্ছন্ন শক্তি। ঋতুভেদে এর তেমন পরিবর্তন হয় না। | ৫। ঋতুভেদে উৎপাদনক্ষমতার পরিবর্তন হয়ে থাকে। |
| ৬। রাসায়নিক সার প্রয়োগ, অম্লমান নিয়ন্ত্রণ, জৈব সার প্রয়োগ প্রভৃতি মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। | ৬। সেচ-নিষ্কাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, ফসল শত্রুদমন ইত্যাদি মৃত্তিকার উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক। |

## মৃত্তিকার উর্বরতা প্রভাবীকরণ

বিভিন্ন কারণে মৃত্তিকার উর্বরতায় তারতম্য দেখা যায়। এই কারণসমূহ প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, (১) প্রাকৃতিক কারণ এবং (২) কৃত্রিম কারণ।

### প্রাকৃতিক কারণ

মৃত্তিকা সৃষ্টিতে যেসব কারণগুলো প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোই প্রাকৃতিক কারণের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হলো :

হয়েছে। এরূপ অবস্থায় হেক্টরপ্রতি প্রায় ১০ কেজি জিঙ্ক সালফেট এবং প্রায় ৬০ কেজি জিপসাম সার শেষ চাষের সময় মৃত্তিকায় দিয়ে জিঙ্ক ও সালফারের অভাব পূরণ করা যায়। এ ছাড়া মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ প্রয়োগে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়।

**(৪) মৃত্তিকা $p^H$ :** $p^H$ দ্বারা মৃত্তিকার অম্লত্ব, নিরপেক্ষতা এবং ক্ষারক নির্ণয় করা হয়। $p^H$ ৭ থেকে নিচের দিকে নামলে মৃত্তিকার অম্লত্ব বেড়ে যায়। পাঠ যতো নিচে নামে মৃত্তিকার অম্লত্ব ততো বাড়ে। যে মৃত্তিকার $p^H$ ৭, সে মৃত্তিকা নিরপেক্ষ অর্থাৎ অম্ল বা ক্ষার কোনটাই নয়। ৭-এর বেশি $p^H$ যতোই বাড়তে থাকে মৃত্তিকা ততো বেশি ক্ষার হয়ে থাকে। এই $p^H$ যখন ৪ থেকে ৫ অথবা ৮ থেকে ১২ এর মধ্যে থাকে মৃত্তিকা তখন গাছের অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি ফসফরাস যোগান দিতে ব্যর্থ হয়। এরূপ মৃত্তিকায় ফসফরাস সংবদ্ধ (fixed) হয়ে যায় অর্থাৎ এক প্রকার অদ্রবণীয় যৌগে পরিণত হয় ফলে ফসফরাস গাছের কোনো কাজে আসতে পারে না। লোহা, ক্যালসিয়াম এবং এলুমিনিয়ামের সাথে ফসফরাসের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এলুমিনিয়াম ফসফরাসের সাথে মিলিত হয়ে কিভাবে জটিল যৌগের সৃষ্টি করে তা নিচে উপস্থাপন করা হলো—

$$Al^{+\,+} + H_2PO_4^{-} + 2H_2O \dashrightarrow 2H^{+\,+} + Al(OH)_2\,H_2PO_4$$

(অদ্রবণীয় যৌগ)

এ ছাড়া মৃত্তিকার অধিক অম্লাত্বক অবস্থায় ($p^H$ ৪ এর কম) কতকগুলো পুষ্টি উপাদান, যেমন—লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি মৃত্তিকায় এত বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হয় যে তা গাছে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্যদিকে অধিক ক্ষারত্ব অবস্থায় মৃত্তিকা রসে উচ্চ চাপ সৃষ্টি হওয়ায় মৃত্তিকা গাছকে দ্রবীভূত পুষ্টি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। মৃত্তিকা $p^H$ নিরপেক্ষ বা ঈষৎ অম্লাত্বক বা ক্ষারত্ব অর্থাৎ ৬ থেকে ৮ এর মধ্যে থাকলে প্রায় সব ফসলই মৃত্তিকা থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। এই অবস্থায় উর্বর মৃত্তিকার উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন মৃত্তিকা অণুজীব এবং পুষ্টি উপাদানের উপর $p^H$ মানের প্রভাব ৭ নং চিত্রে দেখানো হলো।

চিত্র ৭-এ দেখা যায় যে, নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, সালফার $p^H$ মান ৬ এর উপরে গেলে গাছের জন্য সহজলভ্য হয়। অন্যদিকে ফসফরাস ৬ থেকে ৭.৫ এর মধ্যে অধিকতর লভ্য। ছত্রাক একমাত্র অণুজীব যার উপর $p^H$ মানের কোনো প্রভাব দেখা যায় না। পক্ষান্তরে লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা এবং কোবাল্ট $p^H$ মান নিচের দিকে লভ্য হয়।

**(৫) জৈব পদার্থ :** জৈব পদার্থকে মৃত্তিকার প্রাণ বলা হয়। এটি মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা প্রভাবকারী অন্যতম প্রধান নিয়ামক। এটি একদিকে যেমন মৃত্তিকার ভৌত অবস্থার উন্নতি করে, অপরদিকে তেমনি উদ্ভিদের অনেক পুষ্টি উপাদান যোগান দিয়ে থাকে। এ ছাড়া মৃত্তিকাস্থ নানাপ্রকার জীবাণু, যেমন—ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, কেচোঁ প্রভৃতির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে পরোক্ষভাবে মৃত্তিকায় উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এক কথায়, জৈব পদার্থ

মৃত্তিকায় এমন এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে সেই মৃত্তিকার শস্য বা গাছপালাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে বেগ পেতে হয় না।

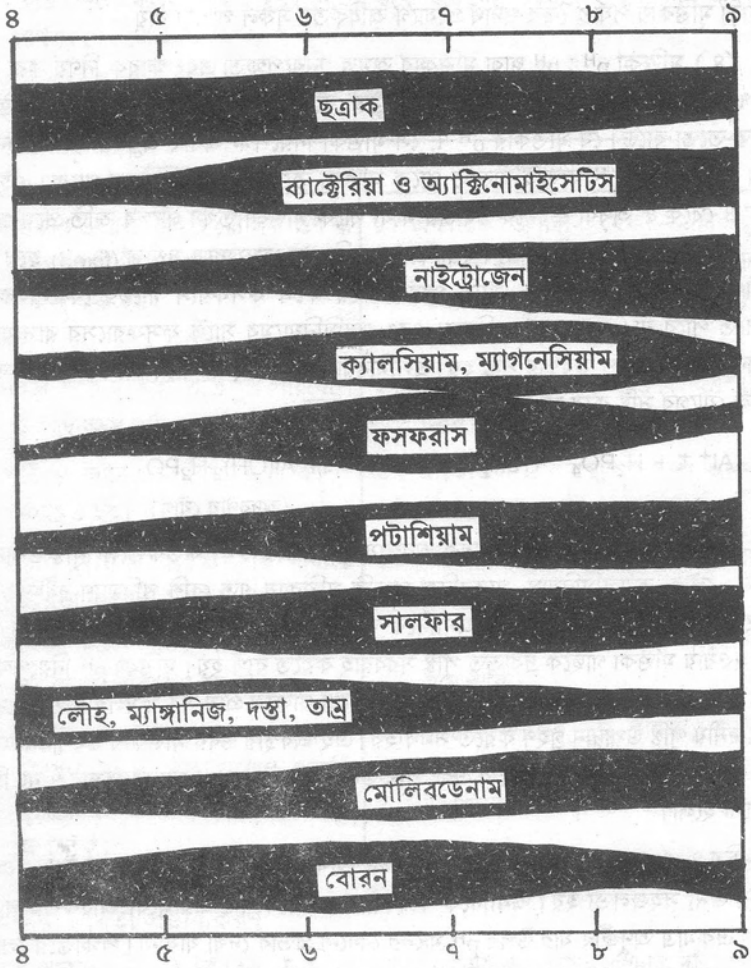


চিত্র ৭ : মৃত্তিকা অণুজীব ও পুষ্ট উপাদানের লভ্যতার উপর $p^H$ মানের প্রভাব

## মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি ও রক্ষার উপায়

মৃত্তিকা উর্বরতা প্রভাবীকরণ এবং উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় কিছুটা সমজাতীয় হলেও উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এটি বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

জমি থেকে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে মৃত্তিকার এমন পরিচর্যা দরকার যাতে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়। তা না হলে মৃত্তিকা

(১) **উৎস শিলা :** গাছপালা ১৬ থেকে ২০টি খনিজ পদার্থ পুষ্টি হিসেবে গ্রহণ করত: পরিপুষ্টি লাভ করে থাকে। মৃত্তিকার এ সমস্ত খনিজ পদার্থ সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন প্রকারে শিলা থেকে উৎপন্ন হয়। যে শিলাতে যতো বেশি রকম খনিজ পদার্থ বিদ্যমান, সে শিলা থেকে সৃষ্ট মৃত্তিকা ততো বেশি উর্বর হয়ে থাকে। যেমন আগ্নেয় শিলাতে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সংখ্যা বেশি বলে এ শিলা থেকে সৃষ্ট মৃত্তিকা অধিকতর উর্বর।

(২) **জলবায়ু ও উদ্ভিদ :** প্রধানত জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়েই পৃথিবীর এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার উদ্ভিদাঞ্চল গড়ে উঠেছে। নিরক্ষীয় অঞ্চল যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং তাপমাত্রাও অধিক সেখানে গড়ে উঠেছে ঘন বনাঞ্চল, আর মধ্যম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে মৃত্তিকা আচ্ছাদিত হয়েছে ঘন তৃণভূমিতে। তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকায় বনাচ্ছাদিত মৃত্তিকার চেয়ে অধিক পরিমাণ জৈব পদার্থ সৃষ্টি হয়, কারণ তৃণভূমির গাছপালা ও পত্রাদি সহজে পচে জৈব পদার্থ সৃষ্টি করে। এসব মৃত্তিকা গাছপালার নানারকম পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে পারে। উত্তর আমেরিকার তৃণভূমি অঞ্চল 'প্রেইরি' এবং রাশিয়ার 'সারনোজে,' মৃত্তিকা জৈব পদার্থের আধিক্যের জন্যই এতো উর্বর।

অধিক বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের উপরিভাগের উর্বর মৃত্তিকা বৃষ্টিপাতের দরুন ধুয়ে অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়। অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদান চুয়ানো প্রক্রিয়ার নিম্নস্তরে শিকড়ের নাগালের বাইরে চলে যাবার ফলে খাদ্যের অপচয় ঘটে। আবার এসব অঞ্চলে তাপমাত্রার আধিক্য থাকায় জৈব পদার্থ তাড়াতাড়ি জারিত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে কম বৃষ্টিপাত ও কম উষ্ণ অঞ্চলে জারণ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা থেকে জৈব পদার্থ অত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না, ফলে এসব অঞ্চলের মৃত্তিকায় অধিক দিন ধরে উর্বরতা বজায় থাকে।

(৩) **ভূমির বন্ধুরতা :** পাহাড়ী বা পার্বত্য অঞ্চলের ঢালে মৃত্তিকা সাধারণত অনুর্বর। কারণ ঢালের জন্য উপরিস্তরের উর্বর মৃত্তিকা বৃষ্টির পানির সাথে সহজে ধুয়ে অন্যত্র চলে যায়। অন্যদিকে পাহাড়ের পাদদেশ বা উপত্যকার মৃত্তিকায় এবং সমতল ভূমির মৃত্তিকায় পুষ্টি উপাদান সহজে ধুয়ে যায় না, জমা থাকে আবার ক্ষয়ও হয় কম। ফলে এসব মৃত্তিকা অধিকতর উর্বর। নদ–নদীবাহিত পলিকণার কারণে বাংলাদেশের সমতল ভূমির অধিকাংশ এলাকা তাই এতো উর্বর।

(৪) **মৃত্তিকার বয়স :** ভূতাত্ত্বিক বয়স হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছরের আবর্তে রচিত হয়। মহাকালের প্রভাবে যে কোনো জিনিস স্থবির ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এভাবেই বহুদিন আগে সৃষ্ট মৃত্তিকাও ক্ষয়প্রাপ্ত ও নীরস হয়ে বিরানভূমিতে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে মৃত্তিকার অবস্থা এমন হয় যে তখন এটি আর গাছপালা জন্মানোর জন্য কোনো উপাদানই সরবরাহ করতে পারে না। একে তখন মৃত মৃত্তিকা বলা হয়। মেসোপোটেমিয়া, হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো প্রভৃতি অনেক উর্বর মৃত্তিকাঞ্চল এভাবেই মহাকালের নির্মম ছোঁয়ায় অনুর্বর এবং পরিশেষে চাষাবাদের অব্যবস্থার কারণে সম্পূর্ণ অনুর্বর হয়ে সভ্যতার বুক থেকে বিলীন হয়ে গেছে। অপরদিকে নতুন বা কম বয়সের মৃত্তিকা আজও বেশ উর্বরতা বজায় রেখে সভ্যতার গতি

সচল রেখেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নদ-নদী বিধৌত অববাহিকা, সমতল অঞ্চলের মৃত্তিকা চির নতুন বলে তা এতো উর্বর।

### কৃত্রিম কারণ

ফসল উৎপাদনের জন্য মৃত্তিকার গুণাগুণ উন্নতিকল্পে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা সবই কৃত্রিম কারণের অর্ন্তভুক্ত। নিচে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো—

**(১) উত্তমরূপে জমি তৈরি :** জমি ভালভাবে চাষ ও মই দিলে উপরিভাগে ঝুরঝুরে, নরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকার নরম, ঝুরঝুরে অবস্থা সৃষ্টির জন্য জমি সবসময়ই 'জো' অনুযায়ী (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কর্ষণ করা প্রয়োজন। এরূপ ঝুরঝুরে মৃত্তিকায় উদ্ভিদ শিকড় চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে অধিকতর কার্যকরভাবে বিভিন্ন পুষ্টি পরিশোষণ করতে পারে। এছাড়া উত্তমরূপে কর্ষিত জমিতে সার ও জৈব পদার্থ সর্বত্র সমভাবে মিশ্রিত হতে পারে ফলে পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্তিকা ও ফসলে সমভাবে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। অন্যভাবে উল্লেখ করা যায় যে, ত্রুটিপূর্ণ কর্ষিত জমিতে পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকলেও মৃত্তিকা গাছে তা সুষ্ঠুভাবে যোগান দিতে পারে না। উত্তমরূপে কর্ষিত জমিতে রসও যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় ; ফলে রসে দ্রবীভূত পুষ্টি গ্রহণে উদ্ভিদের কোনো অসুবিধা হয় না।

**(২) মৃত্তিকা রস :** গাছের সমস্ত বৃদ্ধিকাল ধরে মৃত্তিকার প্রয়োজনীয় রস অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। কারণ গাছের অধিকাংশ পুষ্টিদ্রব্য মৃত্তিকার রসে দ্রবীভূত হয়ে গাছের গ্রহণযোগ্য হয়। তাই শুষ্ক বা যে মৃত্তিকার পরিমিত রসের অভাব থাকে সেরূপ মৃত্তিকায় গাছের পুষ্টি-গ্রহণ ব্যাহত হয় ফলে গাছের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়ে থাকে। এরূপ মৃত্তিকায় বিদ্যমান পুষ্টি মৃত্তিকাতেই অব্যবহৃত থেকে যায়। তাই মৃত্তিকায় বিদ্যমান পুষ্টি, পরিমিত রস ও অন্যান্য প্রভাবকের সমন্বয়ে মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে শস্যের ফলনও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মৃত্তিকায় নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলাকালে কোনো কোনো সময় বিষাক্ত বা ক্ষতিকারক পদার্থের সৃষ্টি হয়। বৃষ্টি বা সেচের পানিতে এসব ক্ষতিকর পদার্থ ধুয়ে বা দ্রবীভূত হয়ে মাটির নিচে চলে যায়, ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষা হয়।

**(৩) মৃত্তিকা পুষ্টি উপাদান :** ফসলের ক্রমবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মুখ্য ও গৌণ পুষ্টি উপাদান যেমন— নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, সালফার, বোরন, জিঙ্ক প্রভৃতির উপস্থিতি মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এসব পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকলে অনুকূল পরিবেশে গাছ তা গ্রহণ করতে পারে। খুব অল্প মাত্রায় দরকার এমন সব ট্রেস্ উপাদানও মৃত্তিকায় অবশ্যই বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। তা না হলে এসব পুষ্টির অভাবেও মৃত্তিকার উর্বরতা এবং উৎপাদনক্ষমতা তথা ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে পারে। দেশের বরেন্দ্র এলাকার মৃত্তিকায় জিঙ্ক এবং সালফার অভাবে ধান চাষে নতুন সমস্যার সৃষ্টি

একদিন এমন অবস্থায় পৌঁছবে যেদিন এসব মৃত্তিকা থেকে ফসল উৎপাদন আর মোটেই লাভজনক হবে না। আমাদের দেশে অনেক জমি প্রায় এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। জমির স্বল্পতা এবং খাদ্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি-চাহিদা জমির উপর অধিক থেকে অধিকতর চাপের সৃষ্টি করছে। জমির উর্বরতা ও ভৌত অবস্থার প্রতি কোনো খেয়াল না রেখে প্রয়োজনের তাগিদে একই জমিতে বছরের পর বছর ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। কৃষক সাময়িকভাবে অধিক ফলন লাভের আশায় অবিবেচনার সাথে অধিক মাত্রায় রায়ায়নিক সার প্রয়োগ করে জমির ভৌত ধর্মের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে চলেছে। জমিতে জৈব সার ব্যবহার না করার দরুন এই অবস্থা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এসব কারণের জন্য প্রায় অধিকাংশ ফসলের ফলন হ্রাস পাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে হেক্টরে গড় ধানের ফলন যেখানে ৭-৮ টন, বাংলাদেশে সেখানে ফলন মাত্র ২-৩ টন। আজকাল উন্নত প্রযুক্তি, যেমন— উন্নত জাত, পরিমিত পরিমাণ সার, পানি প্রয়োগ, রোগ-বালাই দমন প্রভৃতি যদিও এ ফলন অনেক টন বৃদ্ধি করেছে তবুও মৃত্তিকার প্রতি অবহেলা ও অযত্ন একদিন হয়তো মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। ইতোমধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক এলাকায় মৃত্তিকায় ভৌত ধর্মের অবনতিসহ জিঙ্ক, সালফার, বোরন প্রভৃতি উপাদানের প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে ধান, তুলা প্রভৃতি ফসলের ফলনও কমে আসছে। জমিতে জৈব পদার্থের স্বল্পতাই এর কারণ বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। চুন যে অম্ল-মৃত্তিকার একটি প্রধান সংশোধক, কৃষকরা তা জানেই না। জমির যথাযথ উর্বরতা রক্ষার্থে শস্য-পর্যায় অবলম্বন বা সুবিধামত জমি পতিত রাখা প্রয়োজন — তা যেন কৃষকরা ভুলতে বসেছে। আজকাল বিজ্ঞানের এমন জয়যাত্রাকালে ফসল উৎপাদনে এ রকম অবস্থা চলতে দেয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। চিন্তা-ভাবনা করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করে ফসল উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ আজ সময়ের ডাক। তাই নিম্নলিখিত উপায়গুলোর অবলম্বনপূর্বক মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে—

**(১) জৈব সার প্রয়োগ : জমিতে** প্রতি বছর পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জৈব পদার্থ মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতি ছাড়াও এটি কিছু কিছু করে প্রায় সব রকম পুষ্টি উপাদান গাছকে সরবরাহ করে থাকে। মৃত্তিকার ভৌত অবস্থা উন্নত করার জন্য এটি একটি আদর্শ বস্তু। জৈব পদার্থ প্রয়োগ মৃত্তিকার তাপমাত্রা, পানি ও বায়ু ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়, ফলে গাছপালার জন্য পুষ্টি তাড়াতাড়ি সহজলভ্য হয়ে উঠে। জৈব পদার্থ অনেক সময় গাছকে মূল্যবান হরমোন ও ভিটামিন সরবরাহ করে থাকে।

খামারজাত সার, আবর্জনা সার, সবুজসার, খৈল, ফসলের অবশিষ্টাংশ প্রভৃতি জৈব সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা যায়। এ সবের মধ্যে খামারজাত গোবর সারের পরিমাণ বেশি এবং সহজ লভ্যও বটে। কিন্তু সার হিসেবে জমিতে ব্যবহারের চেয়ে জ্বালানি হিসেবে এটি আজকাল বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ব্যাপারে কৃষকদের এখন থেকেই বিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার। খৈল সারের অপর্যাপ্ততা ও উচ্চমূল্যের ফলে এর ব্যবহার দিন দিন কমে

যাচ্ছে। ফসফরাসের উৎস হিসেবে জমিতে আগে বেশ পরিমাণ হাড়ের গুড়ো ব্যবহার করা হতো। এ সার গাছে ফসফরাস সরবরাহ ছাড়াও জমির ভৌত অবস্থার উন্নতি সাধন করে। কিন্তু বর্তমানে এ সারের ব্যবহার দেখা যায় না। মানুষের বিয়োজিত মল একটি উত্তম জৈব সার যা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। কুসংস্কার মুক্ত হয়ে এ সারটি ব্যবহার করে জমির ভৌত ধর্মের উন্নতিপূর্বক উর্বরতাও বৃদ্ধি করা যায়।

**(২) অজৈব সার প্রয়োগ :** অজৈব সার যেমন ইউরিয়া, ট্রিপল সুপার ফসফেট, মিউরেট অব পটাশ, জিঙ্ক সালফেট, জিপসাম প্রভৃতি প্রয়োজনমতো প্রয়োগ করে জমির উর্বরতার মান বজায় রাখা প্রয়োজন। জমিতে অনবরত শস্য চাষের ফলে জমিতে বিদ্যমান বা বাইরে থেকে প্রয়োগকৃত সার ফসল কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। তাই শস্যের ফলন আশানুরূপ পর্যায়ে রাখার জন্য জমিতে পুনরায় সার প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। একটি ফসল উঠার পর পরবর্তী ফসলের অধিক ফলন লাভের আশায় জমিতে অবশ্যই পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করতে হবে।

**(৪) $p^H$ মান নিয়ন্ত্রণ :** মৃত্তিকায় $p^H$ মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জমির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি বা রক্ষা করা যায়। উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় অধিকাংশ ফসলই $p^H$ মান খুব বেশি বা কম হলে আশানুরূপ ফলন দেয় না। সাধারণত নিরপেক্ষ অথবা কিঞ্চিত অম্ল বা ক্ষারীয় মৃত্তিকাতে প্রায় সব ফসলই ভাল ফলন দেয় অর্থাৎ এ অবস্থায় উর্বর মৃত্তিকা উৎপাদনক্ষম মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। $p^H$ এর মান নিরপেক্ষতার কাছাকাছি থাকলে মৃত্তিকায় রাসায়িনক ও জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় ফলে বিভিন্ন পুষ্টি গাছের জন্য সহজলভ্য হয়ে ওঠে। তবে কিছু বেশি অম্ল বা ক্ষার মৃত্তিকাতেও কতগুলো শস্য ভাল ফলন দিতে পারে, যেমন—ধান, ভুট্টা, তামাক, চা প্রভৃতি অম্ল এবং তুলা, বার্লি, বীট প্রভৃতি ফসল ক্ষার মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে।

নানারকম সার ব্যবহার, অবিবেচিত সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতির কারণে কোনো কোনো সময় মৃত্তিকায় বেশ অম্লত্ব সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় চুনের ব্যবহার দ্বারা অম্লত্ব কমিয়ে মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা রক্ষা করা সম্ভব। অন্যদিকে সালফারজাতীয় সার প্রয়োগে মৃত্তিকার ক্ষারত্ব দূরীভূত করা যেতে পারে।

**(৪) শস্য পর্যায় অবলম্বন :** একই প্লটে প্রতি বছর পর পর একই ফসল বা একই গোত্রের ফসল চাষ করলে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ কমে যায়, ফলে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের অবনতি ঘটে। মৃত্তিকার রস ও বায়ু ধারণ ক্ষমতাও কমে যায়। এসব কারণের জন্য মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পায়। কিন্তু বিচক্ষণতার সাথে শস্য পর্যায় অনুসরণ করে এসব ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মৃত্তিকা সংরক্ষণপূর্বক এর উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। শস্য পর্যায়ে সবুজ সারজাতীয় ফসলের অন্তর্ভূক্তি মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ফলে মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। গভীর ও বিস্তৃত মূলবিশিষ্ট গাছ মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা বৃদ্ধি করে। শিমজাতীয় গাছ সবুজ সার হিসেবে ব্যবহার করলে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ যোগ করার

সাথে সাথে বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেনও মৃত্তিকায় যোগ হয়। এসব কারণে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতি সাধন এবং উর্বরতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া শস্য পর্যায়ে বরবটি, সয়াবিন, বাদাম, আলফালফা, খেশারি, মাশকলাই প্রভৃতি গাছ মৃত্তিকা আচ্ছাদিত রেখে ক্ষয়ীভবন হ্রাস করে থাকে। নিঃসরণ প্রক্রিয়াজনিত গাছের পুষ্টি অপচয়ও রোধপূর্বক এসব গাছ মৃত্তিকায় উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

**(৫) সবুজ সারজাতীয় ফসলের চাষ :** শস্য পর্যায়ে সবুজ সারজাতীয় ফসল অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হলে দুটি শস্যের মধ্যবর্তী সময়ে এ ফসল চাষ করা আবশ্যক। এতে মৃত্তিকার বেশ পরিমাণ জৈব পদার্থের সাথে কিছু নাইট্রোজেনও যোগ হয় ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

**(৬) আগাছা দমন :** জমি থেকে সময়মতো আগাছা অবশ্যই দমন করা প্রয়োজন। আগাছা উদ্ভিদের পুষ্টি, পানি, আলো জায়গা প্রভৃতিতে ভাগ বসায়, ফলে ফসলের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। তাই সময়মতো আগাছা দমন করলে মৃত্তিকার রস, পুষ্টি প্রভৃতিতে আগাছা ভাগ বসাতে পারে না, ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করা সম্ভব হয়।

**(৭) পানিসেচ ও নিকাশের সুবন্দোবস্তকরণ :** পানি গাছপালার জীবন। এই পানিতে পুষ্টি উপাদান দ্রবীভূত হওয়ার পরই গাছ তা শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ করে থাকে। মৃত্তিকাস্থ জীবাণুসমূহের ক্রিয়া যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক, তা মৃত্তিকা রসের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রয়োজনে সময়মতো সেচের মাধ্যমে জমিতে পরিমিত রসের সরবরাহ অব্যাহত রাখা অত্যাবশ্যক।

গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকার পরিমিত পরিমাণ পানি যেমন প্রয়োজন তেমনি অতিরিক্ত পানি ফসলের জন্য খুবই ক্ষতিকর। জলাবদ্ধ জমিতে পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়, অক্সিজেনের অভাবে উদ্ভিদের কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়, শিকড় পচে অবশেষে গাছ মারা যায়। এরূপ অবস্থায় অপকারী ব্যাকটেরিয়া অধিকতর সক্রিয়া হওয়ার ফলে মৃত্তিকার নাইট্রোজেন মৌলিক গ্যাস হিসেবে বের হয়ে নষ্ট হয়। অতএব মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি ও রক্ষার্থে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ফসলের জমি থেকে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন।

**(৮) জমির যথাযথ ব্যবহার :** ফসল উৎপাদনের উদ্দেশে জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। জমি ঝুরঝুরে করে ভালভাবে সমান করলে পানির অধিকতর অনুপ্রবেশ ঘটে, পানি গড়িয়ে যায় না ফলে ক্ষয়ীভবনও বন্ধ হয়। এরূপ অবস্থায় মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষা হয়। কোন জমি কোন ফসলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী সেদিকে লক্ষ্য রেখে জমি ব্যবহার করা উচিত, এতে মৃত্তিকার সব রকম পুষ্টি উপাদানের ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন শস্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন পরিচর্যা পদ্ধতি মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি ও রক্ষার্থে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পাহাড়ী অঞ্চলে কন্টুর, টেরেস বা স্ট্রিপ পদ্ধতিতে জমি চাষ করে মৃত্তিকাক্ষয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক একদিকে যেমন জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করা যায়, অন্যদিকে তেমনি শস্যের ফলনও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

# ভূমি কর্ষণ

(Tillage Practices)

ভূমি কর্ষণ কৃষিবিজ্ঞান জয়জাত্রার প্রথম সোপান। কৃষি কার্যক্রমে ভূমি কর্ষণের অবদান বিশ্বের আদিম মানবসন্তানও উপলব্ধি করতে পেরেছিল। "কর্ষণই সার — Tillage is manure" এই উক্তি ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে কৃষিবিজ্ঞানীদের লেখনীতে প্রকাশ পায়। ভূমি কর্ষণ কৃষির সাথে জড়িত বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন কৌশল।

## ভূমি কর্ষণ

গাছের ক্রমবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মৃত্তিকাকে যে প্রক্রিয়ায় আগাছামুক্ত, নরম ও ঝুরঝুরে করা হয় তাকে ভূমি কর্ষণ বলে। কৃষিবিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে ভূমি কর্ষণের কৌশল ও পদ্ধতিও অধিকতর উন্নতি লাভ করেছে। মৃত্তিকার সঠিক আর্দ্রতায় এবং সঠিক কৌশল অবলম্বনে জমি কর্ষণ শস্যের ফলন বৃদ্ধি করছে। তাই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ভূমি কর্ষণের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত।

বিভিন্ন প্রকার শস্যের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। কোনো শস্য গভীর মূলবিশিষ্ট, কোনোটার মূল আবার অগভীর। কোনো শস্য এঁটেলজাতীয় মৃত্তিকায় ভাল জন্মে, কোনো শস্য আবার দোআঁশ মৃত্তিকায়। কোনো শস্যের জন্য গভীর, উন্নত 'টিলথ' (tilth) দরকার, কোনো শস্য আবার অগভীর, মধ্যম টিল্‌থে ভাল ফলন দেয়। এসব দিক বিবেচনা করে ভূমি কর্ষণ করলে শস্য থেকে আশানুরূপ ফলন লাভ করা সম্ভব।

মৃত্তিকার সঠিক আর্দ্রতায় অর্থাৎ 'জো' মতো জমি কর্ষণ শুরু করাই হলো মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার প্রথম এবং প্রধান কাজ। সঠিক আর্দ্রতায় কর্ষণের উপর উন্নত টিলথ্ অর্থাৎ মৃত্তিকার দানাদার, ঝুরঝুরে মোলায়েম ও ভুষভুষে অবস্থা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। জমির এই 'জো' বা সঠিক আর্দ্রতা নির্ণয় করার সহজতম পদ্ধতি হলো— জমির ১০–১৫ সে. মি. নিচে থেকে এক মুঠো মৃত্তিকা হাতে নিয়ে চাপ দিলে যদি দলা বাধে এবং সেই দলা প্রায় ১ মিটার উঁচু থেকে ছেড়ে দিলে ভেঙে ছড়িয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে মৃত্তিকা 'জো' হয়েছে অর্থাৎ জমি কর্ষণ করার সঠিক সময় উপস্থিত। দেরী না করে উন্নত টিলথের জন্য কর্ষণ শুরু করতে হবে। আর যদি দেখা যায় যে, দলা উপর থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর ভেঙে ছড়িয়ে যায়নি তাহলে বুঝতে হবে যে, মৃত্তিকায় অধিক রস বিদ্যমান। এরূপ অবস্থায় বিশেষ করে ভারী, এঁটেল মৃত্তিকা কর্ষণ করলে চাপড়ার মতো ঠেলা সৃষ্টি হবে বা কর্দমাক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে মৃত্তিকার গঠন সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এরূপ মৃত্তিকা ঝুরঝুরে, দানাদার করে

উন্নত টিলথে আনা কিছুতেই সম্ভব হবে না অর্থাৎ মৃত্তিকায় ভৌত ধর্মের অশেষ ক্ষতি সাধিত হবে। এ অবস্থায় মৃত্তিকা পুনরায় ভালভাবে ভিজিয়ে 'জো' মতো কর্ষণ করলেই মৃত্তিকার ঝুরঝুরে, দানাদার অবস্থা ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। অন্যদিকে শুষ্ক অবস্থায় মৃত্তিকা কর্ষণ করলে বড় বড় শক্ত ঢেলার সৃষ্টি হবে এবং এক্ষেত্রেও মৃত্তিকার গঠন নষ্ট হয়ে ভৌত ধর্মের অবনতি ঘটবে। তাই সব ফসলের জমি প্রস্তুতের জন্য ভূমি কর্ষণ অবশ্যই 'জো' মতো শুরু করা একান্ত দরকার যা মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

রবি মৌসুমে মধ্যম নিচু জমিতে অবশ্য কিছু কিছু ফসল যেমন— মাশকলাই, খেশারি, সরিষা প্রভৃতি ফসল ভেজা মৃত্তিকায় কর্ষণ ছাড়াই আবাদ করার প্রচলন দেখা যায়। আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে বিনা কর্ষণে শুধু জায়গায় জায়গায় গর্ত করে ভুট্টার বীজ বুনে আবাদ করা একটি প্রচলিত প্রথা। প্রাপ্ত রস সংরক্ষণ এবং বায়ুজনিত মৃত্তিকা ক্ষয়রোধই এরূপ চাষের প্রধান লক্ষ্য।

রোপা বা বোনা আমন ধান কাটার পর মৃত্তিকায় কিছু না কিছু রস থাকে। তখন দেরী না করে 'জো' মতো জমি কর্ষণ করাই শ্রেয়। অনেক কৃষক হেলা বা অলসতা করে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না। ফসল কাটার পর তারা শুধু অহেতুক অপেক্ষা করতে থাকে, ফলে জমি ধীরে ধীরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। পরিমিত রসের অভাবে সেই জমি আর কর্ষণোপযোগী থাকে না। আউশ ধান, পাট বা অন্যান্য খরিপ ফসল কাটার পর 'জো' আসার সাথে সাথে জমি কর্ষণ সম্পন্ন করা উচিত। এতে মৃত্তিকায় উন্নত টিলথ প্রস্তুত করা সম্ভব। অন্যদিকে জমিতে পরিত্যক্ত ফসলের অবশিষ্টাংশ পচারও যথেষ্ট সময় পায়। অন্যথায় একদিকে যেমন জমির ভাল টিলথ তৈরি করা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে আবর্জনাদি পচার জন্য এবং পরবর্তী ফসলের জমি তৈরি ও বপনের জন্যও যথাযথ সময় পাওয়া যায় না। তাই 'জো' মতো ও সময়মতো কর্ষণ করে জমি প্রস্তুত করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

**ভূমি কর্ষণের উদ্দেশ্য বা উপকারিতা :** সঠিক আর্দ্রতায় 'জো' মতো ভূমি কর্ষণ মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান দিক। জমি থেকে আশানুরূপে ফলন পেতে হলে 'জো' মতো কর্ষণ করে জমি প্রস্তুত করা একান্ত দরকার। সুষ্ঠু ভূমি কর্ষণ মৃত্তিকার বিভিন্ন উপকার সাধন করে থাকে। নিচে এসব উপকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো—

**(১) মৃত্তিকা ঝুরঝুরে, দানাদারকরণ :** কর্ষণ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা ঝুরঝুরে, দানাদার হয়। মৃত্তিকার এরূপ অবস্থা গাছের ক্রমবৃদ্ধির জন্য উত্তম। সঠিক আর্দ্র অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ জৈবপদার্থযুক্ত মৃত্তিকায় কর্ষণ প্রক্রিয়ায় সহজেই এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা যায়। তবে জমি প্রস্তুত করার সময় মৃত্তিকা দানা কত বড় রাখা বাঞ্ছনীয়, তা সাধারণত শস্যের বীজের আকারে উপর নির্ভর করে। বড় আকারের বীজবিশিষ্ট শস্য যেমন ভুট্টা, আখ, ধান, তুলা প্রভৃতি ফসলের জন্য সৃষ্ট দানা অপেক্ষাকৃত বড় হলেও অসুবিধা নেই। অন্যদিকে পাট, সরিষা, মুলা, কপি, গম, তিল প্রভৃতি ফসলের জন্য মৃত্তিকা দানা অধিকতর ছোট হওয়া

বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে মিহি করে জমি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আবার খুবই ছোট বীজবিশিষ্ট তামাক, পেঁয়াজ প্রভৃতি ফসলের জন্য বীজতলা খুবই সূক্ষ্ম, মিহি করে তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। তবে বারবার চাষ-মই দিয়ে জমি খুব ভালভাবে তৈরি করলেই যে ফসলের জন্য সবসময় ভাল হবে তা বলা যায় না। এরূপ মৃত্তিকা বৃষ্টি বা হাঁটাহাঁটিতে সহজে চেপে, আঁটসাট হয়ে যাবার সম্ভবনা বেশি যা উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর। তাই সেদিক খেয়াল রেখে পরবর্তী সব পরিচর্যা যথাযথভাবে সম্পন্ন করলেই সঠিকভাবে প্রস্তুত একখণ্ড জমি থেকে আশানুরূপ ফলন লাভ করা সম্ভব।

(২) **আগাছা দমন :** জমিতে প্রথমে দু'একবার চাষ-মই দিলেই আগাছা মৃত্তিকা থেকে আলগা হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে জমিতে যে সব আগাছা জন্মে, জমি আবার চাষ-মই দেবার ফলে সেগুলো দমিত হয়। সেই সাথে পূর্ববর্তী ফসলের গোড়া, শিকড় ইত্যাদি আলগা হয়ে জমির উপরে উঠে আসে। তখন সেগুলো জমি থেকে সহজে অন্যত্র দূরীভূত করা যায়। তবে ফসল বপনের আগে প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া গেলে এ সব আগাছা ও আবর্জনা চাষের সাথে মৃত্তিকায় মিশিয়ে দিয়ে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অন্যথায় জমি থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে ফেলাই শ্রেয়।

(৩) **অজৈব ও জৈব সার মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিতকরণ :** জমিতে একবার চাষ দেওয়ার পর পরই গোবর সার বা অন্যান্য জৈব সার জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে আরো দু'একটি চাষ দিলে এসব জৈব পদার্থ মৃত্তিকার সাথে ভালভাবে মিশে যায়। সবুজ সারের জন্য জন্মানো গাছ চাষ-মই দিয়েই মৃত্তিকার সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। রাসায়নিক সার প্রয়োগের পর চাষ-মই দিয়ে তা মৃত্তিকায় ভালভাবে মিশিয়ে দেয়া হয়ে থাকে।

(৪) **মৃত্তিকা অভ্যন্তরস্থ কীট-পতঙ্গ দমন :** উই, পিঁপড়া, উড়চুঙ্গা প্রভৃতি কীট মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বাস করে। উই ও পিঁপড়া মূলজাতীয় ফসল ও গোলআলু খেয়ে নষ্ট করে। উড়চুঙ্গা তামাক, পাট, গম, তুলা প্রভৃতি ফসলের চারার গোড়া কেটে দেয়। বিছা ও গোবরে পোকার কীড়াও এভাবে ফসলের ক্ষতি করে। তুলার গুটি পোকার কীড়া প্রতিকূল পরিবেশে মৃত্তিকা বা শুকানো পাতার নিচে আশ্রয় নেয়। এসব কীড়া পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত হবার পর মৃত্তিকা বা শুকনো পাতা, আগাছা প্রভৃতির নিচে পুত্তলিতে রূপান্তরিত হয়। জমি কর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকা ওলট-পালট করে দেবার ফলে সেই সমস্ত পোকা বিশেষ করে ডিম, কীড়া ও পুত্তলি মৃত্তিকার উপরে উঠে আসে। তখন এগুলো পাখিতে খেয়ে ফেলে। সূর্যের তাপেও এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শস্যের জন্য অপকারী ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়াও মৃত্তিকার উপরে উঠে আসলে সূর্যের তাপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

(৫) **মৃত্তিকার পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ :** অকর্ষিত জমির উপরিভাগ শক্ত, জমাট থাকে বলে বৃষ্টির পানি সহজে মৃত্তিকা অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না, ফলে বেশিরভাগ পানি গড়িয়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু কর্ষণের মাধ্যমে মৃত্তিকা ঝুরঝুরে, আলগা করে দিলে পানি সহজে গড়িয়ে যেতে পারে না। এরূপ অবস্থায় পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তী পর্যায়ে মৃত্তিকা আরও চাষ-মই দিয়ে দানাদার করে দিলে পানি দানায় দানায় শোষিত হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ দানাদার মৃত্তিকা কণার চারদিকে বিদ্যমান পানি গাছ সহজে গ্রহণ করতে পারে।

**(৬) মৃত্তিকার জৈবিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ :** মৃত্তিকার জৈবিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়া পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কর্ষণের ফলে মৃত্তিকাস্থ বায়ু ও পানি চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি হয়, ফলে জীবাণুসমূহের বংশ ও কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এরূপ অবস্থায় জৈব পদার্থের পচন দ্রুততর হয় এবং জৈব পদার্থস্থিত গাছের পুষ্টি উপাদানসমূহ বিমুক্ত হয়ে গাছের জন্য দ্রুত সহজলভ্য হয়ে ওঠে। এসময়ে অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড মৃত্তিকায় নির্গত হয়। এই গ্যাস মৃত্তিকাস্থ পানির সাথে মিশে পুষ্টি উপাদানসমূহকে গাছের জন্য অধিকতর লভ্য করে তোলে। এভাবেই কর্ষণ প্রক্রিয়া মৃত্তিকার জৈবিক ও রাসায়নিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করে থাকে। এছাড়া মৃত্তিকার এরূপ অনুকূল পরিবেশে নাটট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন যোগ করতে সক্ষম হয় যা পরবর্তীতে গাছের কাজে আসে।

(৭) **মৃত্তিকার শক্ত স্তর ভাঙন :** কোনো কোনো সময় মৃত্তিকার নিচে শক্ত স্তরের সৃষ্টি হয় ফলে শিকড়ের নিচের দিকে প্রবেশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় বিশেষ করে গভীর শিকড়বিশিষ্ট ফসল, যেমন—তুলা, পাট প্রভৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। শক্ত স্তরের জন্য গাছের শিকড় নিচের দিকে না যেয়ে পার্শ্বদিকে বাড়তে থাকে ফলে খরার সময় প্রয়োজনীয় রসের অভাবে ফলন হ্রাস পায়। তুলা ফসলে কোনো কোনো জায়গায় এরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তাই জমির নিচের শক্ত স্তর গভীর কর্ষণের মাধ্যমে অবশ্যই ভেঙে দেয়া প্রয়োজন। এতে যে শুধু গাছের শিকড়ই নিচের দিকে বৃদ্ধির সুযোগ পাবে তাই নয়, জমির অতিরিক্ত পানিও চুয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে চলে যাবে। এছাড়া মৃত্তিকার নিচের স্তরে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানও গাছ ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

এছাড়া মরা নদীর দু'পাশে চাষকৃত জমিতে কোথায় কোথায় ১০-১২ মি.মি. মৃত্তিকার নিচে মোটা বালির স্তর দেখতে পাওয়া যায়। এই বালির জন্যই গাছের শিকড় নিচের দিকে বালির মধ্যে প্রবেশ না করে পার্শ্বদিকে বাড়তে থাকে ফলে শিকড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শস্যের ফলন হ্রাস পায়। বালির মধ্যে কোনো পুষ্টি উপাদান বা রস না থাকার জন্য গাছের শিকড়ের এরূপ পার্শ্ববৃদ্ধি ঘটে বলে ধারণা করা হয়। এরূপ অবস্থায় জমিতে যথাযথ পরিমাণে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগপূর্বক কর্ষণের মাধ্যমে তা মৃত্তিকার সাথে মিশিয়ে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতি করে এ সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। নদীর পাড়ে আবাদকৃত তুলা ফসলে কখনও কখনও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

আবার কোনো কোনো অবস্থায় মৃত্তিকাস্থ পানি বা রসের পরিমাণ কমানোর জন্য মধ্যবর্তী কর্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমাদের দেশে তুলা উৎপন্ন কিছু কিছু এলাকায়

তুলার অঙ্গজবৃদ্ধি বন্ধ করে ফুল, ফল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মধ্যবর্তী কর্ষণের মাধ্যমে মৃত্তিকাস্থ অতিরিক্ত রসের পরিমাণ কমানো হয়ে থাকে। এতে ফুল, ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

(৮) **মৃত্তিকা ক্ষয় রোধকরণ :** কর্ষণের মাধ্যমে মৃত্তিকা আলগা করে রাখলে বৃষ্টি বা সেচের পানি সহজে গড়িয়ে মৃত্তিকা ধুয়ে নিতে পারে না। এতে একদিকে যেমন পানির অপচয় হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমনি জমির উপরিস্তরের উর্বর মৃত্তিকা ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

### ভূমি কর্ষণের গভীরতা

ফসলের শিকড়ের দৈর্ঘ্যভেদে কর্ষণ গভীরতা নির্ণয় মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার আর একটি বিশেষ দিক। যে ফসলের শিকড় যতো বেশি নিচে যায় সে ফসলের জন্য মৃত্তিকা ততো গভীরভাবে কর্ষণ করা প্রয়োজন। এতে শিকড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায় গাছেরও ক্রমবৃদ্ধি ভাল হয়ে থাকে। ভূমি কর্ষণের গভীরতা ফসলে বিভিন্নভাবে অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে ; যথা—

(১) **ফসলের আশানুরূপ মূলবৃদ্ধি :** মৃত্তিকা গভীরভাবে কর্ষণ করলে গভীর মূলবিশিষ্ট ফসলের শিকড় মৃত্তিকার অনেক নিচ স্তরে প্রবেশ করতে পারে। এতে গাছ যেমন একদিকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয় অন্যদিকে তেমনি মৃত্তিকার গভীর স্তর থেকে প্রয়োজনীয় রস ও পুষ্টি আহরণ করতে পারে। এর ফলে খরার কারণে উপরিস্তরের মৃত্তিকার রসের অভাব হলেও গাছ নিচের স্তর থেকে রস সংগ্রহ করে স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়।

(২) **পুষ্টির সুষ্ঠু ব্যবহার :** গভীরভাবে কর্ষণ করা মৃত্তিকা অধিকতর ভালভাবে ওলটপালট হয়, এতে উপরের মৃত্তিকা নিচে যায় এবং নিচের মৃত্তিকা উপরে উঠে আসে। এর ফলে মৃত্তিকার নিম্নস্তরে জমাকৃত পুষ্টি উপরের স্তরে গাছের শিকড়ের সহজ নাগালের মধ্যে চলে আসে।

(৩) **ক্ষতিকর পদার্থ বিনষ্টকরণ :** মৃত্তিকার নিম্নস্তরে কখনও কখনও বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়। হিউমিক এসিড, আয়রন সালফাইড এরূপ বিষক্ততা সৃষ্টি করতে পারে। গভীরভাবে জমি চাষ করলে ঐসব পদার্থ দ্বারা বিষাক্ত মৃত্তিকা উপরে উঠে আসে। তখন সূর্যের তাপ ও বায়ুর প্রভাবে এসব বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া মৃত্তিকার গভীরে আশ্রয় নেয়া ক্ষতিকর রোগের জীবাণু ব্যাকটেরিয়া, কীট-পতঙ্গের ডিম, পুত্তলি প্রভৃতিও উপরে উঠে আসার ফলে সূর্যের তাপে নষ্ট হয়ে যায়।

(৪) **জৈব ও সবুজ সারের সুষ্ঠু মিশ্রণ :** মৃত্তিকা গভীরভাবে কর্ষণ করলে জৈব পদার্থ ও সবুজ সার অধিকতর সুষ্ঠুভাবে মৃত্তিকার সাথে মিশে যায় ফলে এদের বিয়োজন দ্রুত ও সুষ্ঠু হয়।

(৫) **লবণাক্ততা দূরীকরণ :** লবণাক্ত মৃত্তিকা গভীরভাবে কর্ষণ করে সেচের পানি দ্বারা ধৌত করলে লবণমিশ্রিত পানি সহজে মৃত্তিকার নিম্নস্তরে দূরীভূত হয়ে যেতে পারে, ফলে মৃত্তিকার লবণাক্ততা হ্রাস পায়।

(৬) **তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ :** গভীরভাবে কর্ষিত মৃত্তিকায় উষ্ণতা ও শৈত্যের সমতা রক্ষা করা যায়। এতে মৃত্তিকা অণুজীবের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, ফলে ভৌত ধর্মের উন্নতি হয়।

(৭) **শক্ত স্তর ভাঙন ও পানিধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ :** কোনো কোনো মৃত্তিকায় গভীরে শক্ত স্তরের সৃষ্টি হয়। এর ফলে শিকড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পানি ও বায়ু চলাচল ব্যাহত হয়। গভীর কর্ষণের মাধ্যমে শক্ত স্তর ভেঙে দিয়ে শিকড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা যায়। তাছাড়া মৃত্তিকার পানিধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চালাচল অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

তবে মৃত্তিকা গভীরভাবে চাষ করলেই যে সব সময় ভাল ফলন পাওয়া যাবে এমনটি আশা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এ প্রসঙ্গে পেনসিলভিনিয়া পরীক্ষা খামারে পরিচালিত গমের ফলনের উপর কর্ষণ গভীরতার পরীক্ষাটি আলোচনা করা যেতে পারে। এতে দেখা যায় যে, ২০ সে.মি. গভীরে কর্ষিত জমি থেকে সর্বোচ্চ ফলন একরে ২৫·২ বুসেল পাওয়া যায়। অন্যদিকে ১২·৫০ বা ৪৫ সে.মি. গভীরে কর্ষিত জমি থেকে যথাক্রমে ২২·৭০ এবং ২৩·৯০ বুসেল ফলন পাওয়া যায়। সারণি ৫–এ পরীক্ষাটির ফলাফল দেয়া হলো—

**সারণি ৫ : গমের ফলনের উপর কর্ষণ গভীরতার প্রভাব**

| কর্ষণ গভীরতা (সে. মি.) | একর প্রতি ফলন (বুসেল) |
|---|---|
| ১২·৫০ | ২২·৭০ |
| ২০·০০ | ২৫·২০ |
| ২৫·০০ | ২৫·০০ |
| ৩৭·৫০ | ২৪·১০ |
| ৪৫·০০ | ২৩·৯০ |

সারণি ৫–এ দেখা যায় যে গভীর কর্ষণ সর্বোচ্চ ফলন প্রদান করতে পারে, এমন ধারণা সঠিক নয়। মোট কথা, গাছের ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যভেদে জমি কর্ষণের গভীরতা নির্ণয়ই সুবিবেচনার বিষয়। গভীর মূলবিশিষ্ট ফসলের জন্য গভীর কর্ষণ এবং অগভীর মূলবিশিষ্ট ফসলের জন্য অগভীর কর্ষণ সাধারণত সন্তোষজনক ফলাফল দিয়ে থাকে। বিশেষ করে ভারী, আঠালো মৃত্তিকার ক্ষেত্রে ফসলের মূলের গভীরতা অনুযায়ী ভূমি কর্ষণ বাঞ্ছনীয়। কারণ এরূপ মৃত্তিকা নিচের স্তরে আলগা, নরম না থাকলে মৃত্তিকার গভীরে শিকড়ের প্রবেশ ব্যাহত হয়ে থাকে। অন্যদিকে বেলেজাতীয় মৃত্তিকায় গভীর কর্ষণ ছাড়াই শিকড়ের গভীরে প্রবেশ ততোটা ব্যাহত হয় না।

কিন্তু রোপা ধানের জমিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এ ক্ষেত্রে জমির ৩০–৩৫ সে. মি. নিচে মৃত্তিকায় একটি শক্তস্তর থাকা বাঞ্ছনীয়। জমির প্রস্তুতকালে কাদা করার সময় বারবার লাঙ্গল চালানো এবং হাঁটাহাঁটির ফলে কাদার নিচে এরূপ শক্ত স্তর সৃষ্টি হয়। রোপা ধানের

জন্য উপযোগী ভারী, কাদাজাতীয় মৃত্তিকার নিচে এরূপ শক্ত স্তর তৈরি করা যায়। শক্তস্তর ভালভাবে তৈরি হলে রোপা আমণে পানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় এবং পানির অপচয়ও কম হয়ে থাকে।

আবার নদীর অববাহিকা এলাকায় কোনো কোনো জমির উর্বর মৃত্তিকা মাত্র ৮–১০ সে.মি. পুরু হতে দেখা যায়। এরূপ জমি যদি ১২–১৫ সে.মি. গভীরে কর্ষণ করা হয়, তাহলে নিচের বালিজাতীয় মৃত্তিকা উপরে এবং উপরের উর্বর মৃত্তিকা নিচে ফসলের শিকড়ের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। এতে এসব মৃত্তিকায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।

অনুরূপভাবে আবার কোনো জমির অন্তঃমৃত্তিকা অনুর্বর হতে পারে। গভীর কর্ষণ দ্বারা এরূপ মৃত্তিকা উপরে উঠে আসলে জমির উর্বরতার অবনতি ঘটে। এরূপ পরিস্থিতিতে মৃত্তিকায় প্রচুর জৈব পদার্থ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে মৃত্তিকার অবস্থা উন্নত করে আশানুরূপ ফলন লাভ করা যেতে পারে। তাই উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্তিকা ও ফসলভেদে জমি কর্ষণের গভীরতা ও টিলথ নির্ণয় করাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কাজ।

মনে রাখা দরকার যে, সব মৃত্তিকার উপরিস্তর নিচস্তর থেকে অধিকতর উর্বর। তাই আশানুরূপ ফসল লাভ করতে হলে উপরিমৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা রক্ষার্থে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

## সপ্তম অধ্যায়

# উদ্ভিদ পুষ্টি

(Plant Nutrients)

পুষ্টি যে কোনো জীবের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে সুষম খাদ্যের সরবরাহ ছাড়া কোনো জীব সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে না। উদ্ভিদের জন্যও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। যে কোনো শস্য থেকে আশানুরূপ ফলন লাভের জন্য সুষম পুষ্টির সরবরাহ নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু উদ্ভিদ পুষ্টির প্রধান উৎস মৃত্তিকা, তাই মৃত্তিকা কণার সাথে এর ক্রিয়া-বিক্রয়া, লভ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা একজন কৃষিবিদের অবশ্য প্রয়োজন। তাই ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের সরবরাহের সাথে সঠিক মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ঘটিয়ে কিভাবে এর অধিকতর কার্যকারিতা বৃদ্ধিপূর্বক আশানুরূপ ফলন লাভ করা যায় সেই বিষয়েই এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হলো।

### শ্রেণীবিভাগ

পুষ্টি বা সারকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায় যথা —

১. জৈব সার এবং

২. অজৈব সার।

### জৈব সার

জীব দেহ থেকে প্রাপ্ত অথবা প্রস্তুত সারকে জৈব সার বলা হয়ে থাকে, যেমন—খামারজাত সার, আবর্জনা পঁচা সার, সবুজ সার, খৈল, হাড়ের গুঁড়া, ছাই, গুয়ানো, মানুষের বিষ্ঠা, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা ইত্যাদি।

### অজৈব সার

যে সমস্ত সার কৃত্রিম উপায়ে কল-কারখানায় প্রস্তুত করা হয় সেগুলোকে অজৈব সার বলে, যেমন-ইউরিয়া, এমোনিয়া সালফেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, এমোনিয়াম সালফেট, মিউরিয়েট অব পটাশ, পটাশিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি।

জৈব ও অজৈব সারের একটি তূলনামূলক বিবরণ সারণি ৬-এ দেয়া হলো।

সারণি ৬ : জৈব ও অজৈব সারের তুলনা

| জৈব সার | অজৈব সার |
|---|---|
| (১) জৈব পদার্থ থেকে সৃষ্ট, সহজে প্রস্তুত করা যায়। | (১) অজৈব পদার্থ থেকে সৃষ্ট, কল-কারখানায় জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। |
| (২) পুষ্টি উপাদানের হার খুব কম। অনুমোদিত পরিমাণ পুষ্টির জন্য অনেক বেশি পরিমাণ জৈব পদার্থ প্রয়োগ প্রয়োজন হয়। | (২) পুষ্টি উপাদানের হার বেশি। প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যের জন্য অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করলেই চলে। |
| (৩) উদ্ভিদের প্রধান পুষ্টি নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম ছাড়াও এতে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকে। | (৩) বিশেষ একটি সারে বিশেষ একটি বা দুটি পুষ্টি উপাদান থাকে। |
| (৪) জমিতে প্রয়োগের বেশ কিছুদিন পরে পুষ্টি উপাদান ফসলের গ্রহণোপাযোগী হয়। | (৪) জমিতে প্রয়োগের অল্প দিনের মধ্যেই পুষ্টি উপাদান ফসলের গ্রহণোপযোগী হয়। |
| (৫) ধীরে ধীরে লভ্য হয় বলে দীর্ঘ দিন ধরে অল্প অল্প করে ফসলে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ চলে। | (৫) প্রয়োগের প্রথম বছরেই পুষ্টি উপাদান নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে ফসফেট জাতীয় কিছু সারের কার্যকারিতা বেশ কিছুদিন ধরে চলে। |
| (৬) প্রয়োজনের অধিক ব্যবহার করলেও মৃত্তিকা বা ফসলের ক্ষতি হয় না। | (৬) প্রয়োজনের অধিক ব্যবহারে মৃত্তিকা ও ফসল উভয়েরই ক্ষতি হয়। |
| (৭) এ জাতীয় সারের ব্যবহারে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতিসহ রাসায়নিক এবং জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। | (৭) এর ব্যবহারে মৃত্তিকার ভৌতধর্মের কোনো উন্নতি হয় না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে থাকে। |
| (৮) গোবর এবং গো-মূত্রে এক প্রকার হরমোন থাকে যা উদ্ভিদের শিকড় ও অঙ্গ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। | (৮) এরূপ কোনো হরমোন দেখা যায় না। |

**জৈব সার :** জৈব পদার্থ মৃত্তিকার একটি অতি প্রয়োজনীয় অবিচ্ছেদ্য অংশ। একে মৃত্তিকার প্রাণ বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এটি মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক এবং

জৈবিক বিক্রিয়ার সমন্বয় ঘটিয়ে মৃত্তিকা এমন অবস্থায় রাখে যেখানে গাছপালা তার পূর্ণ-বিকাশ ও আশানুরূপ ফলনদানে সক্ষম হয়। প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি অনুৎপাদনশীল জমিকে উৎপদনক্ষম জমিতে পরিণত করা সম্ভব। জৈব পদার্থে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ খুব কম হলেও এটি মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতির মাধ্যমে গাছপালার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য করে তোলে। তাই ফসল উৎপাদনে জৈব পদার্থের ভূমিকা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

**জৈব পদার্থের উৎস :** সকল জৈব পদার্থ মূলত উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন। প্রকৃতির বনভূমিস্থ উদ্ভিদের পাতা, ডালপালা, শিকড় এবং বিভিন্ন ঘাসজাতীয় গাছ মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ যোগ করে। জমিতে খামারজাত সার, আবর্জনা সার, ছাই, খৈল, হাড়ের গুড়া প্রভৃতি প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকায় জৈব সারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া জমিতে উৎপন্ন সবুজ সারজাতীয় ফসল, ফসলের অবশিষ্টাংশ প্রভৃতিও মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কিছু পরিমাণ জৈব পদার্থ জীব দেহ থেকেও পাওয়া যায়। মৃত্তিকাস্থ বিভিন্ন জীব-অণুজীব, যেমন—সেন্টিপেড, মিলিপেড, কেঁচো, পিপঁড়া, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতির দেহাবশেষ পচে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ যোগ হয়। এ ছাড়া ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষীর মল-মূত্রও জৈব পদার্থের উৎস হিসেবে কাজ করে।

আমাদের দেশে গরু-বাছুরের মল-মূত্রই জৈব সারের প্রধান উৎস। বিভিন্ন গৃহপালিত পশু-পক্ষী থেকে বছরে যে পরিমাণ সার পাওয়া যেতে পারে তা সারণি ৭-এ দেয়া হলো।

**সারণি ৭ : গৃহপালিত পশুপক্ষী থেকে প্রাপ্ত সারের পরিমাণ**

| পশুপক্ষীর নাম | দৈনিক মলের পরিমাণ (কেজি) | দৈনিক মূত্রের পরিমাণ (কেজি) | দৈনিক মোট পরিমাণ (কেজি) | বছরে গড় (টন) |
|---|---|---|---|---|
| ঘোড়া | ১৮ | ৪ | ২২ | ৮.০০ |
| দুগ্ধবতী গাভী | ২২ | ৯ | ৩১ | ১১.০০ |
| সাধারণ গরু | ২১ | ৮ | ২৯ | ১০.৫০ |
| মেষ | ১০ | ৫ | ১৫ | ৫.৫০ |
| শূকর | ২১ | ১৫ | ৩৬ | ১৩.০০ |
| মুরগি (প্রতি ১০০টি) | -- | -- | ১০ | ৩.৬০ |

সারণি ৭-এ দেখা যায় যে পশুপক্ষীর মধ্যে ১টি শূকরের মল থেকেই সর্বাধিক ১৩.০০ টন জৈব পদার্থ পাওয়া যেতে পারে। তবে আমাদের দেশে শূকরের সংখ্যা খুব কম, তাছাড়া যে পরিমাণ সার এই প্রাণী থেকে পাওয়া যায় তাও দেশের জনসাধারণের কুসংস্কারমূলক মনোবৃত্তির কারণে সংরক্ষিত হয় না।

খামারজাত সারে মলভাগের চেয়ে মূত্রভাগেই অধিকতর পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। এতে তুলনামূলকভাবে নাইট্রোজেন এবং পটাশের পরিমাণ বেশি। তাই মূত্রভাগ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। গোয়ালঘরের মেঝ থেকে মূত্র সহজেই গড়িয়ে নষ্ট হয়ে যায় বা শুকিয়ে যায়। মেঝেতে জায়গায় জায়গায় বিচালি বা খড়কুটো ছড়িয়ে দিলে তাতে মূত্র শোষিত হয়, নষ্ট হতে পারে না। এ সব খড়কুটো গোবরের সাথে পচে উন্নতমানের খামারজাত সার প্রস্তুত করা যায়। এছাড়া গোয়ালঘরের লম্বালম্বি বরাবর গরু-মহিষের পিছনদিকে পাকা নালা নির্মাণ করে দিলে মূত্র পাকা নালা দিয়ে দূরে নিরাপদ স্থানে পাকা গর্তে জমা হতে পারে। জমাকৃত মূত্র বালতি দিয়ে উঠিয়ে কিছু পানির সাথে মিশিয়ে সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা গোবরের গাদায় মিশিয়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

**জৈব সারের পুষ্টি :** জৈব সারের মধ্যে খামারজাত সারের প্রধান উপাদান বা অংশ হচ্ছে পানি। বিভিন্ন জৈব সার উদ্ভিদের প্রধান পুষ্টি উপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ ছাড়াও অপ্রধান কিন্তু অবশ্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিও অল্প পরিমাণ সরবরাহ করে থাকে। সারণি ৮-এ বিভিন্ন জৈব সারের পুষ্টি উপাদানের শতকরা হার দেয়া হলো।

**জৈব পদার্থের গঠন এবং পুষ্টি উপাদান :** জৈব সার জৈব পদার্থ থেকে পাওয়া যায়। আর এই জৈব পদার্থ হলো মৃত্তিকার প্রাণস্বরূপ। তাই এর গঠন এবং ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। জৈব পদার্থ পানি এবং নানা প্রকার রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। পানি ছাড়া অন্যান্য সব উপাদানকে একত্রে কঠিন পদার্থ (dry matter) বলা হয়ে থাকে। একটি আদর্শ জৈব পদার্থে সাধারণত ৭৫ ভাগ পানি এবং ২৫ ভাগ কঠিন পদার্থ থাকে। এই কঠিন পদার্থ সময়ের ব্যবধানে নানারকম ক্রিয়া-বিক্রয়ায় বিযোজিত হয়ে হিউমাসে পরিণত হয়। কঠিন পদার্থে সাধারণত ৬০ ভাগ শ্বেতসার বা শর্করা, ২৫ ভাগ লিগনিন, ১০ ভাগ আমিষ এবং ৫ ভাগ স্নেহজাতীয় পদার্থ বিদ্যমান। ৬০ ভাগ শর্করার মধ্যে রয়েছে ২০-৫০ ভাগ সেলুলোজ, ১০-৩০ ভাগ হেমিসেলুলোজ এবং ১-৫ ভাগ সুগার ও শর্করা। আমিষের ১০ ভাগের মধ্যে আছে এলবুমিন, গ্লোবুলিন, পেপটোন প্রভৃতি। তদ্রুপ ৫ ভাগ স্নেহজাতীয় পদার্থে আছে মোম, তৈল ও চর্বি, রেজিন প্রভৃতি। ২৫ ভাগ লিগনিন একক অবস্থায় বিদ্যমান। জৈব পদার্থের এই সমস্ত উপাদানের মধ্যেই আছে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার প্রভৃতি উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান। পুষ্টি উপাদান হিসেবে কঠিন পদার্থে ৪৪ ভাগ কার্বন, ৪০ ভাগ অক্সিজেন, ৮ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ৮ ভাগ ছাই (ashes) বিদ্যমান। চিত্র ৮-এ জৈব পদার্থের বিভিন্ন গঠন এবং পুষ্টির পরিমাণ দেখানো হলো।

জৈব পদার্থের শর্করা গঠন উপাদানটি কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত। স্নেহজাতীয় উপাদানও প্রধানত কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত। লিগনিন বৃক্ষের কাণ্ডের শেষে দেখতে পাওয়া যায়। কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন লিগনিনেরও প্রধান গঠন উপাদান। কিন্তু আমিষে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ছাড়াও

## সারণি ৮ : পশুপক্ষীর মলমূত্র এবং অন্যান্য জৈব সারের পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ

| জৈব সার | পরিত্যক্ত পদার্থ | পানি ٪ | নাইট্রোজেন ٪ (N) | ফসফরাস ٪ ($P_2O_5$) | পটাশ ٪ ($K_2O$) |
|---|---|---|---|---|---|
| ঘোড়ার মলমূত্র | মল—৮০ ভাগ | ৭৫ | ০·৫৫ | ০·৩০ | ০·৪০ |
| | মূত্র—২০ ভাগ | ৯০ | ১·৩৫ | কিঞ্চিত | ১·২৫ |
| | মোট—৭০ ভাগ | গড়–৭৮ | গড়—০·৭০ | গড়—০·২৫ | গড়—০·৫৫ |
| গরুর মল-মূত্র | মল—৭০ ভাগ | ৮৫ | ০·৪০ | ০·২০ | ০·১০ |
| | মূত্র—৩০ ভাগ | ৯২ | ১·০০ | কিঞ্চিত | ১·৩৫ |
| | মোট—১০০ ভাগ | গড়–৮৬ | গড়—০·৬০ | গড়—০·১৫ | গড়—০·৪৫ |
| ভেড়ার মল-মূত্র | মল—৬৭ ভাগ | ৬০ | ০·৭৫ | ০·৫০ | ০·৪৫ |
| | মূত্র—৩৩ ভাগ | ৮৫ | ১·৩৫ | ০·০৫ | ২·১০ |
| | মোট—১০০ ভাগ | গড়–৬৮ | গড়—০·৯৫ | গড়—০·৩৫ | গড়—১·০০ |
| শূকরের মল-মূত্র | মল—৬০ ভাগ | ৮০ | ০·৫৫ | ০·৫০ | ০·৪৫ |
| | মূত্র—৪০ ভাগ | ৯৭ | ১·৪০ | ০·১০ | ০·৪৫ |
| | মোট—১০০ ভাগ | গড়–৮৭ | গড়—০·৫০ | গড়—০·৩৫ | গড়—০·৪০ |
| হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা | — | — | ১·৬০ | ১·৫০ | ০·৮৫ |
| কম্পোস্ট (কচুরীপানা) | — | — | ৩·০০ | ২·০০ | ৩·০০ |
| কম্পোস্ট (সাধারণ) | — | — | ০·৪০–০·৮০ | ০·৩০–০·৬০ | ০·৭০–১·০০ |
| কম্পোস্ট (শহর ভিত্তিক) | — | — | ১·০০–২·০০ | ১·০০ | ১·৫০ |
| পশুর শুকনো রক্ত | — | — | ১০·০০–১২·০০ | ১·০০–১.৫০ | ০.৬০–০.৮০ |
| হাড়ের গুঁড়ো | — | — | ৪·০০ | ৯·০০ | — |
| মাছের গুঁড়ো | — | — | ৪·০০–১০·০০ | ৩·০০–৯·০০ | ০.৩০–১.০০ |
| সরিষার খৈল | — | — | ৫·১০–৫·২০ | ১·৮০–১·৯০ | ১.১০–১.৩০ |
| চীনাবাদামের খৈল | — | — | ৭·০০–৭·২০ | ১·৪০–১·৬০ | ১·৩০–১·৪০ |
| তিলের খৈল | — | — | ৬·২০–৬·৩০ | ২·০০–২·১০ | ১·২০–১·০০ |
| ধৈঞ্চা | — | — | ০·৬২ | — | — |
| শন | — | — | ০·৭৫ | ০·১২ | ০·৫১ |
| বরবটি | — | — | ০·৭১ | ০·১৫ | ০·৫৮ |
| মাশকলাই | — | — | ০·৮৫ | ০·১৮ | ০·৫৩ |
| মুগ | — | — | ০·৭২ | ০·১৮ | ০·৫৩ |
| ধানের খড় | — | — | ০·৫২ | ০·৫২ | ১·৬১ |
| গমের খড় | — | — | ০·৬৩ | ০·৪৬ | ০·৮৬ |
| আখের পাতা | — | — | ১·২৯ | ০·৫২ | ০·৮৬ |
| আগাছা | — | — | ০·৮০ | ০·৩০ | ০·২০ |
| গৃহস্থালীর ছাই | — | — | — | — | ২·৩০–১২·০ |
| পুকুরের পাঁক | — | — | ০·৩০ | ০·২৫ | ০·২০ |

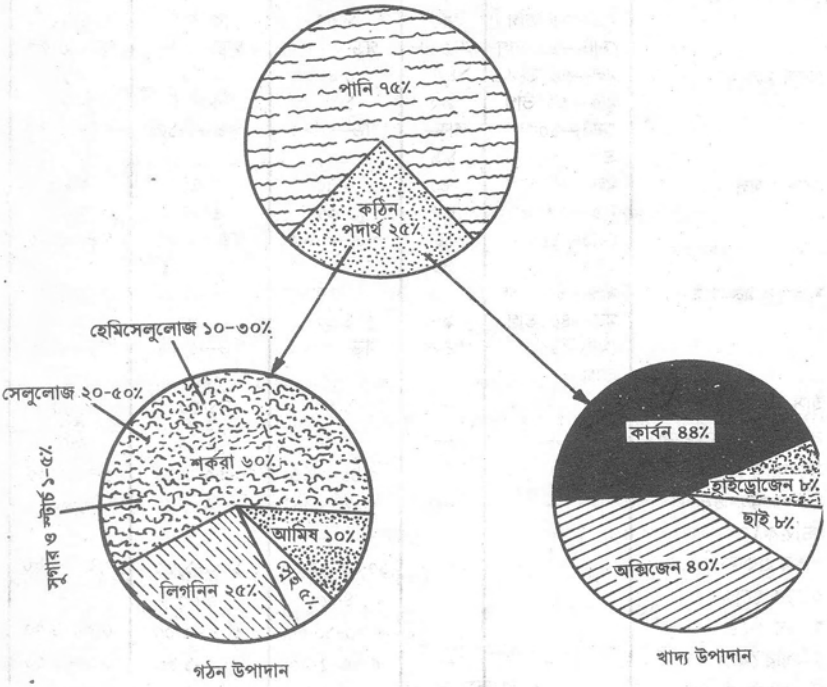


চিত্র ৮ : জৈব পদার্থের গঠন ও পুষ্টি উপাদান

নাইট্রোজেন এবং অল্প পরিমাণে সালফার, আয়রন ও ফসফরাস বিদ্যমান। ছাইয়ের মধ্যে নাইট্রোজেন ছাড়াও অন্যান্য অনেক অজৈব মৌল বিদ্যমান।

**জৈব পদার্থের বিযোজন** (Decomposition) : জৈব পদার্থ মৃত্তিকায় প্রয়োগ করার পর পরই এর বিভিন্ন গঠন উপাদানের উপর জীব-অণুজীবের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে বিযোজন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরিমিত পরিমাণ তাপ ও আর্দ্রতায় অণুজীবের দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে ফলে বিযোজন প্রক্রিয়াও দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। বিভিন্ন গঠন উপদানের বিযোজন প্রক্রিয়া যুগপৎ শুরু হলেও বিযোজন কিন্তু একই সময়ে শেষ হয় না। সর্ব প্রথম সুগার, শর্করা এবং পানিতে দ্রবণীয় সরল আমিষজাতীয় পদার্থের বিযোজন ক্রিয়া শেষ হয়। এভাবে বিযোজন-

ক্রম অনুসারে হেমিসেলুলোজ, সেলুলোজ এবং সবশেষে লিগনিন, চর্বি, মোম প্রভৃতি উপাদানের বিযোজন সম্পন্ন হয়ে থাকে। জৈব পদার্থের গঠন উপাদানের বিযোজনক্রম সংক্ষেপে এরূপে প্রকাশ করা যায়—

প্রথম—সুগার, স্টার্চ এবং দ্রবণীয় সরল আমিষ
দ্বিতীয়—জটিল আমিষ
তৃতীয়—হেমিসেলুলোজ
চতুর্থ—সেলুলোজ
পঞ্চম—লিগনিন, চর্বি, মোম, তেল প্রভৃতি

জৈব পদার্থের উপরোক্ত সমস্ত গঠন উপাদানে উদ্ভিদের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। এই জৈব পদার্থ টাটকা অবস্থায় জমিতে প্রয়োগ করার সাথে সাথে অনুকূল পরিবেশে বিভিন্ন নিম্নগোত্রীয় প্রাণী ও জীবাণু যেমন—ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যাকটিনোমাইসিটস্ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং বিযোজন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই বিযোজনের ফলে জৈব পদার্থ থেকে কার্বন, নাইট্রেট, সালফেট, ফসফেট প্রভৃতি পুষ্টি উপাদান অবমুক্ত হয়ে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য হয়। জৈব পদার্থস্থিত ধাতব মৌলসমূহ $K^+$, $Ca^{++}$, $Mg^{++}$, $Mn^{++}$, $Zn^{++}$ প্রভৃতি ক্যাটায়ন আকারে বিমুক্ত হয় যা উদ্ভিদ প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে। জৈব পদার্থের বিযোজন চূড়ান্ত হলে এটি এক প্রকার কালচে, কোলয়ডাল পদার্থ সৃষ্টি করে যাকে হিউমাস নামে অভিহিত করা হয়। হিউমাসের উপর মৃত্তিকার জীব-অণুজীব আর কোনো ক্রিয়া করতে পারে না। হিউমাসকে পুষ্টি উপাদানের ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা সময়ে সময়ে উদ্ভিদের জন্য বিভিন্ন পুষ্টি সরবরাহ করে থাকে।

প্রতিকূল পরিবেশ যেমন বায়ু অর্থাৎ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে বিযোজন সংঘটিত হলে উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন গ্যাস যথা—মিথেন ($CH_4$), হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$), ইথিলিন ($CH_2$) প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাই জৈব পদার্থে সুষ্ঠু বিযোজনের লক্ষ্যে মৃত্তিকায় যাতে অবাধে বায়ু চালাচল করতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

**জৈব পদার্থের বিযোজন নিয়ামক** (Factors effecting decomposi-tion) : জৈব পদার্থের বিযোজন প্রক্রিয়া খুব জটিল এবং বিভিন্ন নিয়ামক এর সুষ্ঠু বিযোজন-প্রক্রিয়া প্রভাবিত করে থাকে। জৈব পদার্থের বিযোজন প্রভাবকারী এই নিয়ামকগুলো হচ্ছে—

**(১) তাপমাত্রা :** বায়ুমণ্ডল এবং মৃত্তিকায় তাপমাত্রা জৈব পদার্থের বিযোজন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উষ্ণ তাপমাত্রা বিযোজন তরান্বিত করে। ২০-৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মৃত্তিকায় বিযোজন বিলম্বিত হয়। খুব বেশি ঠাণ্ডায় (৫-১০° সেলসিয়াস) বিযোজন প্রক্রিয়া থেমে যেতে পারে।

**(২) মৃত্তিকা রস :** যথাযথ আর্দ্র মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের বিযোজন দ্রুত সম্পন্ন হয়। মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতার কাছাকাছি আর্দ্রতাই জৈব পদার্থ বিযোজনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। খুব শুষ্ক মৃত্তিকা এবং জলাবদ্ধতা অণুজীব বিযোজন ব্যাহত করে থাকে।

(৩) **মৃত্তিকা পুষ্টি :** মৃত্তিকায় পুষ্টি উপাদান বিশেষ করে নাইট্রোজেনের ঘাটতি বিযোজন প্রক্রিয়া ব্যাহত করে। অণুজীবের বংশবৃদ্ধি এবং কর্মকাণ্ডের জন্য নাইট্রোজেন খুবই প্রয়োজন। বিযোজনকালে অণুজীব সাধারণত জৈব পদার্থ ও মৃত্তিকা থেকে নাইট্রোজেন ব্যবহার করে থাকে। এ অবস্থায় বাড়ন্ত ফসলে কোনো কোনো সময় নাইট্রোজেনের অভাব দেখা দিতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে বাইরে থেকে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

(৪) **মৃত্তিকা $p^H$ :** অধিকাংশ অণুজীব মৃত্তিকা $p^H$ ৬ থেকে ৮ এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়া থাকে। মৃত্তিকা $p^H$ ৪·৫ এর কম এবং ৮·৫ এর উপরে গেলে অধিকাংশ অণুজীব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অধিক অম্ল মৃত্তিকা অধিক ক্ষারীয় মৃত্তিকার চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। তাই মৃত্তিকা $p^H$ ৬ থেকে ৮ বিযোজনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

(৫) **মৃত্তিকা বুনট :** সাধারণত এঁটেল দোআঁশ বা পলি এঁটেল শ্রেণীর মৃত্তিকা সুষ্ঠু বিযোজন প্রক্রিয়ার জন্য উপযোগী। এ জাতীয় মৃত্তিকার যথাযথ পানি ধারণ ক্ষমতা এবং উর্বরতা বিযোজন প্রক্রিয়া সহজতর করে।

(৬) **মৃত্তিকায় ক্ষতিকারক পদার্থের উপস্থিতি :** এলুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, বোরন, ক্লোরাইড, দ্রবীভূত লবণ প্রভৃতি অতিরিক্ত মাত্রায় উপস্থিতি এবং ছায়াযুক্ত স্যাঁতস্যাতে অবস্থা জৈব পদার্থের বিযোজন বিঘ্নিত করতে পারে।

(৭) **জৈব পদার্থের প্রকার :** শিমজাতীয় গাছের বিযোজন দানাজাতীয় গাছের চেয়ে দ্রুত সম্পন্ন হয়। কচি, নরম গাছ বয়স্ক গাছের চেয়ে তাড়াতাড়ি বিযোজিত হয়। শক্ত খড়জাতীয় দ্রব্যের বিযোজনে সময় বেশি লাগে।

(৯) **মৃত্তিকায় মিশ্রণ :** জৈব পদার্থ কর্ষণের মাধ্যমে ভালভাবে মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত করে দিলে তাড়াতাড়ি এবং সুষ্ঠুভাবে বিযোজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সব জৈব পদার্থ মৃত্তিকার নিচে মিশিয়ে দেয়া শ্রেয়।

### কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত (C : N ratio)

মৃত্তিকায় কার্বন নাইট্রোজেন পরিমাণের অনুপাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই অনুপাত উদ্ভিদের সময়মতো প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন প্রাপ্তিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। একটি আদর্শ মৃত্তিকায় C : N অনুপাত সাধারণত ১০ : ১ থেকে ১২ : ১ অর্থাৎ ১০–১২ ভাগ কার্বন এবং ১ ভাগ নাইট্রোজেন। অনুকূল পরিবেশে মৃত্তিকার এই অনুপাত সাধারণত পরিবর্তন হয় না।

টাটকা জৈব পদার্থে এই অনুপাত কিন্তু অনেক বেশি। এটি আবার জৈব পদার্থের প্রকারের উপর নির্ভর করে। শিম এবং খামারজাত জৈব পদার্থে C : N অনুপাত সাধারণত ২০ : ১ থেকে ৩০ : ১ এর মধ্যে থাকে। এ জাতীয় নরম, কচি জৈব পদার্থে অনুপাতের পার্থক্য আরও কম। অন্যদিকে শক্ত খড়জাতীয় জৈব পদার্থে এই অনুপাত ৮০–১০০ : ১ এর

মতো হতে পারে। পক্ষান্তরে অণুজীবের দেহে এই অনুপাত মাত্র ৫ : ১ থেকে ১০ : ১ এর মধ্যে।

যদি উপরোক্ত যে কোনো জৈব পদার্থ টাটকা অবস্থায় মৃত্তিকায় যোগ করা হয় তাহলে উদ্ভিদের জন্য লভ্য $NO_3$ নাইট্রোজেন কত সময়ধরে অলভ্য থাকবে তা সাধারণত এ টাটকা জৈব পদার্থের C: N অনুপাতের উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকায় প্রয়োগকৃত একটি বেশি C: N পার্থক্যবিশিষ্ট জৈব পদার্থ সম্পূর্ণভাবে বিযোজন হতে সাধারণত বেশি সময় লাগে যদি মৃত্তিকায়ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম থাকে অর্থাৎ বেশি সামায়ধরে $NO_3$ উদ্ভিদের জন্য অলভ্য থাকে যা ফসলের ক্রমবৃদ্ধি ব্যাহত করে। এই অলভ্যতার কারণ হলো বিযোজনকালে অণুজীবসমূহ তাদের বংশবৃদ্ধি ও ক্রিয়া চালিয়ে যাবার জন্য জৈব পদার্থস্থিত নাইট্রোজেন ছাড়াও মৃত্তিকাস্থ নাইট্রোজেন ব্যবহার করে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে অণুজীবের অধিকতর বংশবৃদ্ধি ও ক্রিয়া বৃদ্ধির মাধ্যমে বিযোজন তরান্বিত করা যায়, ফলে $NO_3$ তাড়াতাড়ি ফসলের জন্য লভ্য হয়ে উঠে। অন্যদিকে কম পার্থক্য বিশিষ্ট জৈব পদার্থ, যেমন—শিম বা খামারজাত পদার্থ বিযোজনে সময় কম লাগে অর্থাৎ কম সময় $NO_3$ গাছের জন্য অলভ্য থাকে।

যদি টাটকা জৈব পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করতে হয় তাহলে উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যাতে কোনো ফসল বপনের আগেই জমিতে প্রয়োগকৃত জৈব পদার্থের বিযোজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। তা না হলে ভালভাবে বিযোজিত জৈবপদার্থই জমিতে প্রয়োগ করা উত্তম। তবে যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে জমিতে প্রয়োগকৃত জৈব পদার্থ বিযোজনের আগেই ফসল বপন করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার জমিতে প্রয়োগ করে এরূপ অবস্থায় উন্নতি করা যেতে পারে। মৃত্তিকায়, আদর্শ অবস্থায় শিমজাতীয় জৈব পদার্থ প্রয়োগ করার প্রথম সপ্তাহেই শস্য বপন করা যেতে পারে। বিশেষ করে সবুজ, নরম অবস্থায় মৃত্তিকায় মিশিয়ে দিলে। অন্যদিকে বয়স্ক, খড়জাতীয় জৈব পদার্থ প্রয়োগ করার ১·৫ থেকে ২ মাস পর শস্য বপন করা বাঞ্ছনীয়। তবে আমাদের দেশে শস্য চাষ নিবিড়তা খুবই বেশি বলে এখানে সব সময়ই জমিতে সুষ্ঠুভাবে বিযোজিত জৈব সার প্রয়োগ করাই সবচেয়ে ভাল। সারণি ৯–এ কতকগুলো জৈব পদার্থের কার্বন–নাইট্রোজেন অনুপাত দেখানো হলো।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, টাটকা জৈব পদার্থের চেয়ে বিযোজিত জৈব পদার্থে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ কিছু কম থাকে, কারণ জৈব পদার্থ বিযোজনকালীন দীর্ঘ সময়ে নানাভাবে, যেমন—মুত্রের গড়িয়ে ও নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় অপচয়, গ্যাসীয় আকারে নাইট্রোজেন ও পটাশের অপচয় ইত্যাদি ঘটে থাকে। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এরূপ অপচয় বন্ধ করে বিযোজিত জৈব পদার্থের গুণগত মান উন্নত রাখা যায়।

সারণি ৯ : বিভিন্ন জৈব পদার্থের কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত

| জৈব পদার্থের নাম | জৈব কার্বন (%) | মোট নাইট্রোজেন (%) | C : N অনুপাত |
|---|---|---|---|
| আলফালফা (কচি) | ৪০ | ৩.০ | ১৩ : ১ |
| ক্লোভার (বয়স্ক) | ৪০ | ২.০ | ২০ : ১ |
| ব্লু গ্রাস | ৪০ | ১.৩ | ৩০ : ১ |
| ভুট্টা গাছ | ৪০ | ১.০ | ৪০ : ১ |
| ধান ও গমের খড় | ৪০ | ০.৫ | ৮০ : ১ |
| করাতের গুড়ো | ৪৫ | ০.২ | ২২৫ : ১ |
| ব্যাকটেরিয়া | ৫০ | ১০.০ | ৫ : ১ |
| অ্যাকটিনোমাইসেটিস | ৫০ | ৮.৫ | ৬ : ১ |
| ছত্রাক | ৫০ | ৫.০ | ১০ : ১ |
| মৃত্তিকা হিউমাস | ৫০ | ৪.৫ | ১১ : ১ |

**জৈব পদার্থের উপকারিতা** (Benefits of organic matter) : জৈব পদার্থ নানাভাবে মৃত্তিকার উপকার সাধন করে থাকে। জৈব পদার্থের এরূপ উপকারী ক্রিয়া নিচে আলোচনা করা হলো—

**(১) মৃত্তিকার কণাবন্ধন :** জৈব পদার্থ মৃত্তিকা কণার আশানুরূপ দানাবন্ধনে এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। জৈব পদার্থ সম্বলিত মৃত্তিকা ঝুরঝুরে, দানাদার হওয়ায় এর পানি ধারণ ক্ষমতা এবং বায়ু চলাচল উন্নত হয়।

**(২) পুষ্টি উপাদান লভ্যকরণ :** জৈব পদার্থের উপর নানাবিধ ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে এ থেকে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান, হরমোন প্রভৃতি নিঃসৃত হয়। অনুকূল পরিবেশে এসব পুষ্টি দ্রুত নিঃসৃত হয় এবং গাছপালা তা পরিশোষণ করে দ্রুত বাড়তে পারে।

জৈব পদার্থের বিযোজনকালে যেসব জৈব এসিড নিঃসৃত হয় তা মৃত্তিকাস্থ কম লভ্য খনিজ পদার্থকে দ্রবীভূত করে গাছের জন্য সহজলভ্য করে তোলে। প্রতিস্থাপনীয় এবং সুলভ ক্যাটায়নসমূহ, যেমন — পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের জন্য হিউমাস ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। হিউমাস প্রতিস্থাপনীয় এবং সুলভ অবস্থায় নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়াম আকারে ধরে রাখে। এটি শিকড় দ্বারা শোষিত হয়ে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়।

**(৩) পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি :** জৈব পদার্থসম্বলিত মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়, ফলে এটি অধিক পরিমাণে পানি ধরে রাখতে পারে। এরূপ মৃত্তিকায় সাধারণত পানির অভাবজনিত কারণে গাছপালার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না। একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সাধারণ এঁটেল দো-আঁশ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের মাত্র ১১ শতাংশ পানি ২০ সে. মি. গভীরতার নিচে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে, জৈব সার বিশিষ্ট অনুরূপ মৃত্তিকায় সেই গভীরতায় ৪৮ শতাংশ পানি প্রবেশ করে ও সংরক্ষিত থাকে।

(৪) **বাফার হিসেবে ক্রিয়া :** চুন এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকা অভ্যন্তরে যে অবাঞ্ছিত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, জৈব পদার্থ মৃত্তিকার ভৌত গুণাগুন উন্নত করে তা কেটে উঠতে মৃত্তিকাকে সহায়তা করে। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্যতা রক্ষা করে।

(৫) **তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ :** কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক জাবড়া (mulch) গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা হ্রাস করে এবং শীতকালে মৃত্তিকা উষ্ণ রাখে। ফলে জৈব পদার্থ প্রয়োগকৃত মৃত্তিকায় সব ঋতুতেই গাছের উপযোগী তাপমাত্রা থাকায় শিকড় ভালভাবে বৃদ্ধি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জাবড়া কৃত জমিতে তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে ২৩·৫০° সেলসিয়াসে নেমে আসে। অন্যদিকে উন্মুক্ত জমিতে দেখা যায় ৩৭° সেলসিয়াস। এভাবে জৈব পদার্থ প্রয়োগ শীত মৌসুমেও মৃত্তিকার তাপ বাড়িয়ে এটি বাঞ্ছিত মাত্রায় রাখা সম্ভব।

(৬) **অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ :** অম্লীয় মৃত্তিকায় ফসফরাসকে অধিকতর লভ্য করার কাজে জৈব পদার্থ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিযোজন ক্রিয়ার ফলে জৈব পদার্থ থেকে কিছু যৌগ নিঃসৃত হয় যা ফসফরাস অপেক্ষা অধিক তাড়াতাড়ি লোহা ও এ লুমিনিয়ামের সাথে সংবদ্ধ হতে পারে। এর ফলে মৃত্তিকায় অদ্রবণীয়, অলভ্য লোহা ফসফেট এবং এলুমিনিয়াম ফসফেট কম প্রস্তুত হয়, ফলে ফসফরাসের লভ্যতা বৃদ্ধি পায়। তাই অম্লীয় মৃত্তিকায় ফসফরাসের লভ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য মৃত্তিকার প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থ ও চুন প্রয়োগ করতে হয়। হেক্টর প্রতি ১০ থেকে ১৫ টন জৈব সার এবং ২–৩ টন চুন অম্লীয় মৃত্তিকায় প্রয়োগ করে আশানুরূপ ফলন লাভ করা যায়।

(৭) **ক্ষয়ীভবন হ্রাস :** মৃত্তিকার উপরে প্রয়োগকৃত জৈব পদার্থ আচ্ছাদনের কাজ করে বৃষ্টিপাতজনিত আঘাত ও পানি প্রবাহের গতি কমিয়ে দেয়, ফলে ক্ষয়ীভবন হ্রাস পায়। এ ছাড়া মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণ পানিও জমা হয়।

(৮) **বাষ্পীভবন হ্রাস :** জৈব পদার্থ ও জৈব জাবড়া মৃত্তিকা শীতল রাখে, বায়ুর গতিবেগ কমিয়ে দেয় ফলে বাষ্পীভবনজনিত পানির অপচয় কমে আসে। বাষ্পীভবন হ্রাস পাওয়ায় মৃত্তিকার উপরিভাগের পানি ও পুষ্টি উপাদান গাছের জন্য সহজলভ্য হয়।

(৯) **বায়ু চলাচলের উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি :** কেঁচো, পিঁপড়া, উইপোকা প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় জীবসমূহ জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টি সংগ্রহকালে চলাচলের মাধ্যমে মৃত্তিকা আলগা এবং সরু সরু নালার সৃষ্টি করে। সৃষ্ট এই সব ফাঁকা স্থানে বেশি পরিমাণ বায়ু থাকতে পারে, ফলে গাছের শিকড়ের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন লাভে কোনো অসুবিধা হয় না। তাছাড়া এইসব ছিদ্র পথে অতিরিক্ত কার্বন ডাই–অক্সাইডও দূরীভূত হয়।

(১০) **জীব-অণুজীবের পুষ্টির উৎস :** জৈব পদার্থ মৃত্তিকা জীব–অণুজীবসমূহের খাদ্য ও শক্তির প্রধান উৎস। এরা জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বংশবিস্তার করে থাকে। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে এরা বিভিন্ন ক্রিয়া–প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভৌত ও রাসায়নিক

ধর্মের উন্নতিপূর্বক মৃত্তিকাকে অধিকতর উর্বর করে। মৃত্তিকার জীবাণুসমূহই জৈব পদার্থের বিযোজন সম্পন্ন করে থাকে।

**(১১) শস্যের ফলন বৃদ্ধি :** উপরোক্ত সব ক্রিয়ার ফলে শস্যের ফলনের উপর জৈব পদার্থের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। কৃষি গবেষণা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত একটি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, অন্যান্য সারের অনুমোদিত মাত্রার সাথে হেক্টর প্রতি ২০ টন গোবর সার প্রয়োগে ৮৫·৭৫ টন টমেটোর ফলন পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, গোবর প্রয়োগ না করলে ফলন ৬৬·৯৫ টনে নেমে আসে। বাঁধাকপির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফলন পাওয়া যায়।

## জৈব পদার্থ বৃদ্ধির উপায় (Measures for increasing O.M. in soil)

কৃষি জমিতে জৈব পদার্থের গুরুত্ব কত অপরিসীম তা উপরের আলোচনা হতে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ফসলের জমিতে যাতে সব সময়ই বাঞ্ছিত পরিমাণ জৈব পদার্থ বিদ্যমান থাকে তা লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে মৃত্তিকায় সন্তোষজনক পরিমাণ জৈব পদার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব।

**(১) জমিতে খামারজাত ও অন্যান্য জৈব পদার্থ প্রয়োগ :** প্রতি বছর জমিতে খামারজাত সার, খৈল, ছাই প্রভৃতি জৈব পদার্থ প্রয়োগ করলে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়াও শস্যের জন্য কিছু পরিমাণ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যোগান দেয়া যায়। জমিতে জৈব পদার্থ বৃদ্ধিকল্পে আমাদের দেশে গোবর সার ব্যবহারের ভূমিকা অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে চাষের জমিতে যে পরিমাণ জৈব পদার্থ যোগ করা হয় তার অধিকাংশ আসে এই গোবর সার থেকে। কিন্তু বর্তমান চিত্র ভিন্নতর। বর্তমানে গোবর সারের অধিকাংশই জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে মৃত্তিকাকে এর প্রাণ 'জৈব পদার্থ' থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এর ফলে মৃত্তিকার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের অবনতি ঘটে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য গোবর সার অন্য কোনো কাজে ব্যবহার না করে সবটুকুই জমিতে ফসল উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য সব কৃষকদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে।

এ ছাড়া জমিতে প্রয়োজনমতো আবর্জনা সার, খৈল সার, ছাই প্রভৃতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কচুরীপানা একটি অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ যা সারা দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। এসব কচুরীপানা পঁচিয়ে জমিতে প্রয়োগ করে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ ছাড়া বাসা-বাড়ির দৈনন্দিন বর্জিত মাছ-মাংস ও শাক-সবজির উচ্ছিষ্ট একটি নির্দিষ্ট গর্তে জমিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি হয়, যা জমিতে প্রয়োগের ফলে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতি ছাড়াও বেশ কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি মৃত্তিকায় যোগ করা যেতে পারে।

**(২) শস্য পর্যায় অনুসরণ :** ফসল উৎপাদনে শস্য পর্যায় অনুসরণ করলে আশানুরূপ ফলন লাভের সাথে সাথে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থও যোগ করা সম্ভব হয়।প্রতি বছর

একই জমিতে একই প্রকার ফসল চাষ করলে মৃত্তিকায় জৈবপদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়, গঠন ও বুনটের অবনতি ঘটে, ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা কমে আসে। শস্য পর্যায়ে সবুজ সারজাতীয় ফসল, যেমন—খেশারি, মটরকলাই প্রভৃতি শস্যের অন্তর্ভুক্তিতে মৃত্তিকার জৈব পদার্থ ও সাথে সাথে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতি সাধিত হয়। অন্যদিকে তুলা, ভূট্টা প্রভৃতি ফসলের চাষ মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, কারণ সারিতে বপনকৃত এসব ফসলের অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা জৈব পদার্থের জারণ ক্রিয়া তরান্বিত করে থাকে। তাই এ সব শস্য চাষে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(৩) **চুনের ব্যবহার :** জমিতে বিশেষ করে অম্লীয় মৃত্তিকায় চুন ব্যবহার করা উচিত। চুন ভৌত ধর্মের উন্নতিপুর্বক মৃত্তিকাস্থ জীবাণুসমূহের ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। জমিতে এক যোগে খামারজাত সার, চুন ও সবুজ সার ব্যবহার করলে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

(৪) **সুষ্ঠু শস্য কর্তন পদ্ধতি :** ফসল কাটার সময় যতোটা সম্ভব বেশি পরিমাণে গোড়া রেখে শস্য কর্তন করা উচিত। এই সব গোড়া কর্ষণের মাধ্যমে জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি পচে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। পাট, তুলা প্রভৃতি ফসলের ক্ষেত্রে ফসল কাটার আগেই প্রায় সব পাতা জমিতে ঝরে যায়। এসব পাতা পচে জমিতে জৈব পদার্থ বৃদ্ধি পায়। ধানের বিশেষ করে আমন ধানের অবশিষ্টাংশ জ্বালানি হিসেবে বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার না করে জমিতে পচানো দরকার। আমাদের দেশে জমিতে জৈব পদার্থ যোগ করার এটি একটি সহজ ও উত্তম ব্যবস্থা। শিমজাতীয় শস্য না উপড়িয়ে গোড়া কেটে ফসল আহরণ করা উচিত, এতে শিকড়ে সঞ্চিত নাইট্রোজেনের সাথে সাথে গোড়া পচে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

(৫) **জমি কর্ষণে সতর্কতা অবলম্বন :** সাধারণত অকর্ষিত জমিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ জমা থাকে। কিন্তু জমি কর্ষণ করার পর থেকেই জৈব পদার্থের সঞ্চয় কমতে শুরু করে। কারণ চাষাবাদ প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উদ্ভিদসমূহ ধ্বংস এবং সঞ্চিত জৈব পদার্থের বিযোজনে সহায়তা করা হয়, ফলে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ কমতে থাকে। তাই গ্রীষ্মপ্রধান ও বাংলাদেশের মতো উপ-গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ সংরক্ষণ করতে হলে বিশেষ সতকর্তার সাথে চাষ করতে হবে। জমি ঘন ঘন কর্ষণ করা উচিত নয়, এতে আলগা মৃত্তিকায় খুব সহজেই অধিক পরিমাণে বায়ু চলাচলের কারণে জারণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, ফলে জৈব পদার্থের অপচয় ঘটে। কোনো কোনো সময় গভীর কর্ষণহেতু নিচ স্তরের জমাকৃত জৈব পদার্থ উপরে উঠে আসে যা জারণ প্রক্রিয়ায় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

(৬) **মানুষের বা হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার :** জমিতে মানুষের বা হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা বা মল প্রয়োগ করে জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। সুষ্ঠুভাবে বিযোজিত মানুষের মল বিভিন্ন শীতকালীন শাক-সবজি উৎপাদনে খুবই ফলপ্রসূ।

(৭) **পিট মৃত্তিকার ব্যবহার :** বিল বা হাওর অঞ্চলের পচা, কালো তলানি জমিতে প্রয়োগ করে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। যশোর অঞ্চলে জমিতে এরূপ তলানির ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়।

### অজৈব সার

উদ্ভিদ তার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান প্রধানত অজৈব সারের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ২০টি উপাদানকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে—নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, আয়রন, কপার, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, বোরন, মডিলডেনাম, কোবাল্ট, সোডিয়াম, ভেনাডিয়াম, সিলিকন এবং ক্লোরিন। এর মধ্যে নাইট্রোজেন থেকে লোহা—এই ১০টি গাছের জন্য বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয় বলে এদেরকে প্রধান বা মুখ্য পুষ্টি বলা হয়। কপার থেকে কোবাল্ট—এই ৬টি পুষ্টি উদ্ভিদের মধ্যে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন বলে এদেরকে অপ্রধান পুষ্টি বলে। বাকী ৪টি উপাদান উদ্ভিদের তেমন কোনো উপকারে আসে না।

উপরোক্ত পুষ্টিসমূহ গাছপালা ৩টি উৎস থেকে গ্রহণ করে থাকে, যথা—(১) বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ও অক্সিজেন, (২) পানি থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এবং (৩) মৃত্তিকা থেকে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, সালফার, বোরন ইত্যাদি প্রধান ও অপ্রধান পুষ্টিসমূহ।

প্রধান বা অপ্রধান যে কোনো প্রকার পুষ্টিই হোক না কেন, গাছ তা মৌলিক অবস্থায় গ্রহণ করতে পারে না। প্রতিটি মৌলিক পদার্থের কোনো এক বিশেষ রাসায়নিক আকারে (ionic form) গাছ গ্রহণ করতে পারে। কোন পুষ্টি উপাদান, কোন আকারে ফসলের গ্রহণোপযোগী হয় তা সরণি ১০-এ দেখানো হলো।

জৈব সার প্রয়োগ মৃত্তিকায় উন্নতি সাধন হয়ে থাকে। অজৈব সার প্রয়োগে শস্যের ফলনে উন্নতি দেখা গেলেও মৃত্তিকার ভৌত ধর্ম এবং রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ায় প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে বলে ধারণা করা হয়। এসব ব্যাপারে অবশ্য দ্বি-মতেরও অবকাশ রয়েছে। কোনো কোনো ভারতীয় বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেন যে ক্রমাগত নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকার ক্ষতি হয় বলে যে ধারণা করা হয় তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সারের অভাবে নাইট্রোজেন সারের সমতা বিনষ্ট হবার কারণে ফলন এবং মৃত্তিকার উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। নাইট্রোজেন সার কখনও কখনও অবশ্য মৃত্তিকার ভৌত গুণাগুণ এবং রাসায়নিক ও জৈবিক বিক্রিয়া প্রভাবিত করে থাকে। কিন্তু

BANSDOC Library
Accession No...18599

সারণি ১০ : উদ্ভিদ কর্তৃক পুষ্টি গ্রহণের আকার বা অবস্থা

| পুষ্টি উপাদানের নাম | যে আকারে গাছ গ্রহণ করে |
|---|---|
| নাইট্রোজেন (N) | নাইট্রেট ($NO_3^-$) অথবা অ্যামোনিয়াম আয়ন ($NH_4^+$) |
| ফসফরাস (P) | অর্থোফসফেট ($H_2PO_4^=$) অথবা মাধ্যমিক অর্থোফসফেট আয়ন ($HPO_4^=$) অথবা $PO_4^{\equiv}$ আয়ন। |
| পটাশিয়াম (K) | পটাশ আয়ন ($K^+$) |
| কার্বন (C) | কার্বন ডাই–অক্সাইড ($CO_2$) |
| হাইড্রোজেন (H) | পানি ($H_2O$) |
| অক্সিজেন (O) | বায়বীয় অক্সিজেন ($O_2$) |
| ক্যালসিয়াম (Ca) | ক্যালসিয়াম আয়ন ($Ca^{++}$) |
| ম্যাগনেসিয়াম (Mg) | ম্যাগনেসিয়াম আয়ন ($Mg^{++}$) |
| সালফার (S) | সালফেট ($SO_4^=$) অথবা সালফাইট আয়ন ($SO_3^=$) |
| আয়রন (Fe) | ফেরাস ($Fe^{++}$) অথবা ফেরিক আয়ন ($Fe^{+++}$) |
| বোরন (B) | বোরেট ($B_0B_7^=$) অথবা বরিক আয়ন ($H_2BO_3^=$) |
| ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | ম্যাঙ্গাজিন আয়ন ($Mn^{++}$) |
| কপার (Cu) | কপার আয়ন ($Cu^{++}$) |
| জিঙ্ক (Zn) | জিঙ্ক আয়ন ($Zn^{++}$) |
| মলিবডেনাম (Mo) | মিলিবডেট আয়ন ($MoO_4^=$) |
| সোডিয়াম (Na) | সোডিয়াম আয়ন ($Na^+$) |
| ক্লোরিন (Cl) | ক্লোরাইড আয়ন ($Cl^-$) |
| কোবাল্ট Co | কোবাল্ট আয়ন ($Co^{++}$) |

বিজ্ঞানসম্মতভাবে সার বাছাই করে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের সমতা বজায় রাখলে এ সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তবে আমাদের দেশে যথেচ্ছাভাবে সারের ব্যবহার মৃত্তিকার গুণাগুণ নষ্ট করছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এখানে এখন মৃত্তিকার উপর প্রধান প্রধান অজৈব সারের প্রভাব এবং এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

**নাইট্রোজেন সার :** নাইট্রোজেন সারের মধ্যে প্রথমে মৃত্তিকার উপর অ্যামোনিয়াম সালফেটের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। এই সার সম্পূর্ণভাবে পানিতে দ্রবণীয়। ফলে আর্দ্র মৃত্তিকায় প্রয়োগ করার সাথে সাথে নাইট্রোজেন শস্যের ব্যবহারের জন্য লভ্য হয়ে উঠে। মৃত্তিকার নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এটি খুব দ্রুত নাইট্রেটে ($NO_3^-$) রূপান্তরিত হয়ে গাছের জন্য লভ্য হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় অ্যামোনিয়াম সালফেটের নাইট্রোজেন দ্রুত নাইট্রেটে পরিণত হয়। নাইট্রেট আকারে রূপান্তরিত হবার পর গাছ দ্বারা ব্যবহৃত না হলে অনুস্রবণের ফলে এ সারের অপচয় হয়। এই কারণের জন্য জমিতে শস্য বৃদ্ধিকালে এ সার ব্যবহার করা হয় যাতে সার প্রয়োগের পর নাইট্রোজেন লভ্য হবার সাথে

সাথে গাছ কর্তৃক ইহা ব্যবহৃত হতে পারে। তবে একই জমিতে বছরের পর বছর অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করলে মৃত্তিকায় অম্লত্বের (acidity) সৃষ্টি হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেটের অ্যামোনিয়াম আয়ন ($NH_4^+$) অথবা নাইট্রেট আয়ন ($NO_3^-$) আকারে গাছপালা নাইট্রোজেন ব্যবহার করে এবং সালফেট আয়ন ($SO_4^=$) মৃত্তিকার হাইড্রোজেন আয়নের ($H^+$) সাথে মিলিত হয়ে সালফিউরিক এসিডের ($H_2SO_4$) সৃষ্টি করে, ফলে মৃত্তিকা অম্লীয় হয়ে যায়। এই এসিডের আবার বিভাজন ঘটে এবং হাইড্রোজেন আয়ন মৃত্তিকার কর্দম হিউমাসের সাথে মিশে যায় এবং সালফেট আয়ন মৃত্তিকায় বিদ্যমান ক্যালসিয়াম আয়নের ($Ca^{++}$) সাথে মিলিত হয়ে ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) রূপে মৃত্তিকার পানির সাথে বের হয়ে যায়। এইভাবে ক্যালসিয়াম আয়নের স্থানান্তর এবং সালফিউরিক এসিডের সৃষ্টি মৃত্তিকাকে অম্লীয় করে তোলে। এক পর্যায়ে অম্লত্ব এত বৃদ্ধি পায় যে চুন প্রয়োগের মাধ্যমে অম্লত্ব দূর না করলে এরূপ মৃত্তিকায় আর কোনো ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় না। তাছাড়া অধিকহারে অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকার গঠনেরও অবনতি ঘটে। অম্লত্ব দূর করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে হেক্টরে ২–৬ টন চুন ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে অ্যামোনিয়াম সালফেটের ব্যবহার নেই বললেই চলে। চা ফসলে কিছু পরিমাণ অ্যামোনিয়াম সালফেট বর্তমানে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

শস্য–কর্তৃক ব্যবহার, অনুস্রবণ, ক্ষয়ীভবন ও বাষ্পীভবনহেতু মৃত্তিকাস্থ নাইট্রোজেন খুব দ্রুত নিঃশেষিত হয়। তাই মৃত্তিকার উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা রক্ষার্থে সারের মোট অনুমোদিত মাত্র কয়েক কিস্তিতে জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। বিশেষ করে বেলেজাতীয় মৃত্তিকায় যেখানে এটি খুব দ্রুত অনুস্রবণ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার নিম্নস্তরে চলে যায় সে সব মৃত্তিকায় সার থেকে আশানুরূপ ফলন লাভের আশায় এর প্রয়োগ কিস্তির সংখ্যা ভারী, কাদাজাতীয় মৃত্তিকার তুলনায় অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মৃত্তিকায় অনুকূল পরিবেশে যখন জৈব বা অজৈব পদার্থের নাইট্রোজেন সঠিকভাবে অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন সাথে মিশে, তখন উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে। এই মিশ্রণের ফলে নাইট্রোজেন নাইট্রেট্ আয়ন বা অ্যামোনিয়াম আয়নে রূপান্তরিত হয়। যেসব মৃত্তিকায় বায়ু ঠিকমত চলাচল করতে পারে, সে সব মৃত্তিকায় সবটুকু নাইট্রোজেনই জীবাণুর বিক্রিয়ার ফলে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। এই নাইট্রেট আকারে গাছের জন্য সহজে লভ্য ফলে গাছ তা দ্রুত এবং সহজে গ্রহণ করতে পারে। আবার অন্যদিকে দ্রুত অনুস্রবণের দরুন সহজে এর অপচয়ও ঘটে। পক্ষান্তরে অ্যামোনিয়াম আকারে নাইট্রোজেন গাছের জন্য অতটা দ্রুত লভ্য নয়। মৃত্তিকা কণার সাথে এটি খুব শক্তভাবে আটকে থাকে বলে এর অনুস্রবনজনিত অপচয় কম।

সোডিয়াম নাইট্রেট খুব দ্রুত কাজ করে কারণ এতে সহজলভ্য নাইট্রেট বিদ্যমান। এই জন্য খুব দ্রুত কাজ পেতে হলে এ সার ব্যবহার করা যায়। সোডিয়াম নাইট্রেট সার ব্যবহারে মৃত্তিকায় অম্লত্ব সৃষ্টি হয় না, বরং অম্লত্ব থাকলে তা দূর হয়। কারণ সোডিয়াম নাইট্রেটের নাইট্রেট গাছ গ্রহণ করে, সোডিয়াম মৃত্তিকায় থেকে যায়। এই সোডিয়াম পরোক্ষভাবে শস্য

উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সোডিয়াম মৃত্তিকায় আবদ্ধ পটাশ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় মুক্ত করে। তখন এই অবমুক্ত পটাশ শস্যের জন্য লভ্য হয়ে উঠে। তবে এর পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে মৃত্তিকার ভৌত অবস্থার অবনতি ঘটে। এই সারের সোডিয়াম আয়ন মৃত্তিকার কণাসমূহ ভেঙে সূক্ষ্মতর করে ফেলে। এইসব সূক্ষ্ম কণা এক সাথে মিশে মৃত্তিকায় আঠালোভাব সৃষ্টি করে যার ফলে এ জাতীয় মৃত্তিকায় কাজ করা খুব অসুবিধা হয়ে পরে। এ অবস্থায় মৃত্তিকায় পানি নিষ্কাশন ও বায়ু চালাচল বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া এ সার মৃত্তিকায় অধিকতর ক্ষারীয় অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। তাই মৃত্তিকার উন্নত গুণাগুণ রক্ষার্থে এ সারের ব্যবহার খুব বিবেচনার সাথে করা উচিত।

নাইট্রোজেন সারের মধ্যে বাংলাদেশে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সর্বাধিক। অনুকূল পরিবেশে জমিতে প্রয়োগকৃত এ সারের সবটুকু নাইট্রোজেনই এক সপ্তাহের মধ্যে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়ে থাকে যা গাছ গ্রহণ করে। যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা অনুসরণ প্রক্রিয়ায় অপচয় হয়।

ইউরিয়া সারের যথেচ্ছা, ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকায় অম্লত্বের সৃষ্টি হতে পারে। তবে অ্যামোনিয়াম সলফেটের ব্যবহারজনিত সৃষ্টি অম্লত্বের মত ততো প্রকট নয়। সময়মতো প্রয়োজন অনুসারে হেক্টর প্রতি ১–৩ টন চুন ব্যবহার করে অম্লত্ব সঠিক মানে আনয়ন করা যেতে পারে।

নাইট্রোজেনের উৎস শস্যের ফলনের উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে একটি পরীক্ষায় দেখা যায়। বিহারের পুসায় গমের ফলনের উপর নাইট্রোজেন সারের বিভিন্ন প্রকার উৎসের প্রভাব বের করার জন্য পরীক্ষাটি চালানো হয়। এতে দেখা যায় যে, খামারজাত সার থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন একর প্রতি সর্বাধিক ফলন ৫৮১ পাউন্ড পর্যন্ত প্রদান করে। এতে প্রমাণিত হয়ে যে জৈব সার অজৈব সার থেকে শ্রেয়। বিভিন্ন সার থেকে সমপরিমাণ নাইট্রোজেন সরবরাহ করা হলেও খামারজাত সারের ক্ষেত্রে ফলন অধিক হবার কারণ হলো এটি নাইট্রোজেন সার সরবরাহ করা ছাড়াও মৃত্তিকায় ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক ধর্মের উন্নতি সাধন করে। আবার জৈব সারের মধ্যে খৈলের চেয়ে যে খামারজাত সার উন্নতমানের তাও এই পরীক্ষায় দেখা যায় (চিত্র ৯)। তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ নাইট্রোজেন সরবরাহের জন্য যে বিরাট পরিমাণ জৈব পদার্থের দরকার, তা যোগাড় করা অসুবিধাজনক হতে পারে।

**ফসফরাস সার :** মৃত্তিকায় ফসফরাস প্রায় সব সময়ই অন্য কোনো মৌলের সাথে আবদ্ধ হয়ে গাছের জন্য অলভ্য হয়ে যায়। এরূপ বিক্রিয়ার ফলে মৃত্তিকা থেকে এর অনুস্রবণ হয় না। অম্লীয় মৃত্তিকায় লোহা ও এলুমিনিয়াম মৌলের সাথে এমনভাবে সংবন্ধন (phosphate fixation) হয়ে যায় যে গাছ তখন আর তা গ্রহণ করতে পরে না। অন্যদিকে ক্ষারীয় মৃত্তিকায় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম একে অলভ্য করে তোলে। এই দুটি অসুবিধার কারণে এবং মৃত্তিকা পরিশোধনে অবহেলার কারণে প্রায় মৃত্তিকাতেই ফসফরাসের ঘাটতি দেখা যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব পদার্থ এবং প্রয়োজনীয় চুনের ব্যবহার দ্বারা অম্লীয় মৃত্তিকা পরিশোধনপূর্বক ফসফরাস সার থেকে আশানুরূপ ফলন লাভ করা যায়। সাধারণত মৃত্তিকা

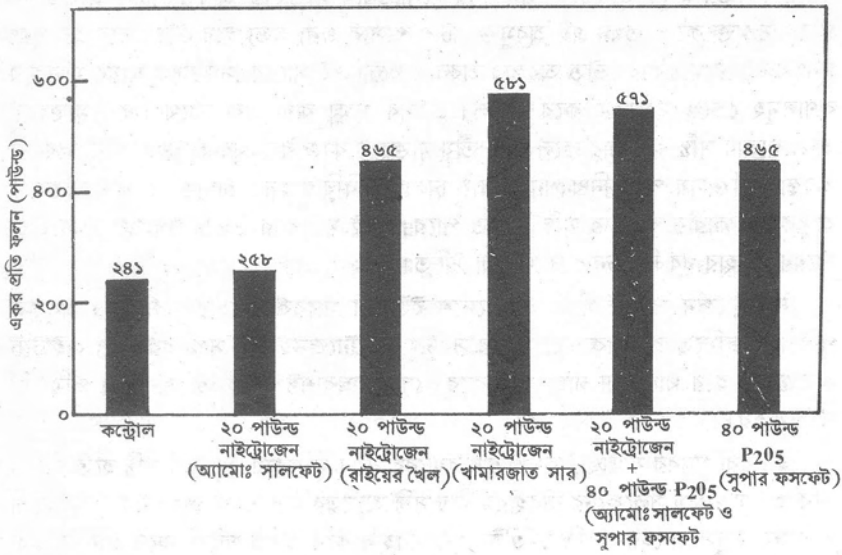


চিত্র ৯ : গমের ফলনের উপর নাইট্রোজেন সারের বিভিন্ন উৎসের প্রভাব

$p^H$ ৫·৫ থেকে ৭·৫ এর মধ্যে ফসফরাসজোতীয় সার ভাল কাজ দেয়। এটি $H_2PO_4^-$ অথবা $HPO_4^=$ অথবা $PO_4^=$ আয়ন আকারে গাছ গ্রহণ করে।

**পটাসিয়াম সার :** পটাশজাতীয় সকল সারই পানিতে দ্রবণীয় হলেও মৃত্তিকা থেকে অনুস্রবণ প্রক্রিয়ায় এর অপচয় ঘটে না। পটাসিয়াম আয়নসমূহ কর্দম ও হিউসপাস কণার সাথে আটকে থাকে, ফলে অনুস্রবণজনিত কারণে এর অপচয় হয় না। উদ্ভিদের জন্য লভ্য অবস্থায় থেকে যায়। পটাশজাতীয় সারসমূহ নিরপেক্ষ, তাই তা মৃত্তিকা অম্লীয় বা ক্ষারীয় করে না। এটি $K^+$ আয়ন আকারে গাছ গ্রহণ করে থাকে।

**ক্যালসিয়াম বা চুনজাতীয় সার :** ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ মৃত্তিকা খুবই উৎপাদনক্ষম মৃত্তিকা। অন্যদিকে অবার অতিমাত্রায় ক্যালসিয়ামজাতীয় সার প্রয়োগের ফলে কোনো কোনো মৌলের দ্রবণীয়তা এতো বেশি হ্রাস পায় যে তখন এর ঘাটতি দেখা যায়। সাধারণত ম্যাঙ্গানিজ, বোরন ও লোহার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা অধিক ঘটতে পারে। তাই মৃত্তিকায় চুন প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা অবশ্যই দরকার।

চুনজাতীয় সারের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার চেয়ে পরোক্ষ ক্রিয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। চুন মৃত্তিকার ভৌত গুণাগুণ এবং রাসায়নিক ও জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে শস্যাদির ক্রমবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে থাকে। চুনের যৌগসমূহ বিজ্ঞজনোচিতভাবে ব্যবহার করলে এটি মৃত্তিকার উন্নতি সাধনপূর্বক অধিক ফলন প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। চুনের ক্রিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা — (১) রাসায়নিক ক্রিয়া, (২) জৈবিক ক্রিয়া এবং (৩) ভৌত ক্রিয়া

(১) **রাসানিক ক্রিয়া :** চুনের প্রধান কাজ হলো মৃত্তিকার অম্লত্ব বাঞ্ছিত সীমারেখায় আনয়নপূর্বক ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা। এটি উদ্ভিদের অদ্রবণীয় পুষ্টি দ্রবীভূত করে গাছের জন্য লভ্য করে তোলে। চুন প্রয়োগে মৃত্তিকার $pH$ ৭ এর কাছকাছি আসলে ক্ষতিকর এলুমিনিয়াম, লোহা এবং ম্যাঙ্গানিজ মৃত্তিকায় অদ্রবণীয় হয়ে পড়ে এবং গাছের আর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তাছাড়া এ সময় অলভ্য ফসফরাস ও মলিবডেনাম গাছের জন্য লভ্য হয়ে উঠে। আর্দ্র জলবায়ু এলাকার বেলে এবং অম্ল মৃত্তিকাতে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত বেশী দ্রবণীয় হওয়ায় চুয়ানো প্রক্রিয়ায় এটি মৃত্তিকা থেকে বের হয়ে যেতে পারে। ক্যালসিয়াম $Ca^{++}$ আকারে শোষিত হয়।

(২) **জৈবিক ক্রিয়া :** চুনের ব্যবহারে মৃত্তিকা জীবাণুসমূহের ক্রিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মৃত্তিকার সিমবায়োটিক এবং নন্-সিমবায়োটিক উভয় প্রকার ব্যাকটেরিয়ার কার্যাদি বৃদ্ধির ফলে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকায় নাইট্রেফিকেশন প্রক্রিয়াও দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়, ফলে নাইট্রোজেন সার জমিতে প্রয়োগ করার সাথে সাথে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়ে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠে।

মৃত্তিকাস্থ বিভিন্ন ধরনের জীব-অণুজীব জৈব পদার্থের পচন ঘটিয়ে থাকে। পরিমাণ-মতো চুন প্রয়োগে এই সমস্ত জীব-অণুজীবের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, ফলে জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া সহজে ও দ্রুত সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া জৈব পদার্থস্থ নানা প্রকার পুষ্টি উপাদান অবমুক্ত হয়ে গাছের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠে।

উদ্ভিদের কিছু কিছু রোগ মৃত্তিকায় চুনের ব্যবহারে দূরীভূত হয়। দূর্ভাগ্যক্রমে গোলআলুর স্ক্যাব রোগটি কিন্তু আবার মৃত্তিকায় চুনের অপরিকল্পিত ব্যবহারে জন্য হয়ে থাকে। মৃত্তিকায় অত্যাধিক পরিমাণ চুন ব্যবহার করলে তরমুজের মতো কিছু শস্য ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

(৩) **ভৌত ক্রিয়া :** দানাযুক্ত, ঝুরঝুরে মৃত্তিকা কৃষিকাজের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এরূপ মৃত্তিকার পানি ও বায়ুধারণ ক্ষমতা বেশি এবং এদের চলাচলও সুগম হয়। কিন্তু মিহি দানাযুক্ত, ভারী মৃত্তিকা চেপে বসে যায় বলে এতে পানি ও বায়ু চলাচল বিঘ্নিত হয়। এ জাতীয় ভারী মৃত্তিকায় চুন প্রয়োগ করলে মৃত্তিকা দানাযুক্ত, ঝুরঝুরে হওয়ার ফলে ভৌত ধর্মের উন্নতি ঘটে। চুনের ক্যালসিয়াম সিমেন্টের ন্যায় কাজ করে মৃত্তিকার দানাবন্ধনে সাহায্য করে। এরূপ মৃত্তিকায় তখন আর পানি বা বায়ু চলাচলে কোনো সুবিধার সৃষ্টি হয় না। চুন

প্রয়োগের ফলে জৈব পদার্থের উপর মৃত্তিকাস্থ জীবাণুসমূহের ক্রিয়া জোরদার হয়, এতে জৈব পদার্থের পচন তরান্বিত হওয়ার ফলে জমিতে দ্রুত হিউমাসের সৃষ্টি হয়। বর্ণিত কারণসমূহের জন্য মৃত্তিকার উর্বরতা এবং উৎপাদনক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

**ম্যাগনেসিয়াম :** এটি মৃত্তিকায় দ্রবণীয় বলে ক্যালসিয়ামের মতো চুয়ানো প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা থেকে বের হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আর্দ্র এলাকায় অম্ল ও বেলে এবং ক্ষার মৃত্তিকায় এর ঘাটতি দেখা যায়। মৃত্তিকায় অত্যধিক পটাসিয়াম প্রয়োগ করলে ম্যাগনেসিয়ামের অভাব সৃষ্টি হতে পারে। উদ্ভিদে এর প্রয়োজন খুব কম বলে সাধারণত মৃত্তিকায় এর ঘাটতি দেখা দেয় না। এটি $Mg^{++}$ আকারে পরিশোষিত হয়ে থাকে।

**সালফার :** মৃত্তিকায় সন্তোষজনক পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকলে সাধারণত সালফারের ঘাটতি দেখা যায় না। উদ্ভিদ কর্তৃক পরিশোষিত হয়ে এবং চোয়ানো প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার সালফার কমতে থাকে। ইদানিং বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকার মৃত্তিকায় বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকায় সালফারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত জৈব পদার্থের অভাব সালফারের ঘাটতির কারণ বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। জৈব পদার্থ এবং জিপসাম বা সালফারের গুঁড়া প্রয়োগ করে এ ঘাটতি পূরণ করা যায়।

**আয়রন :** মৃত্তিকায় সাধারণত আয়রনের অভাব দেখা যায় না তবে ক্ষারীয় এবং জলাবদ্ধ মৃত্তিকায় এটি প্রায়ই অলভ্য অবস্থায় থাকে বলে উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ বা সালফারের পরিমাণ বৃদ্ধিপূর্বক মৃত্তিকা বিক্রিয়া উন্নত করার মাধ্যমে মৃত্তিকাস্থ অলভ্য আয়রন উদ্ভিদের জন্য লভ্য করা যেতে পারে। প্রয়োজনে মৃত্তিকায় ফেরাস সালফেট প্রয়োগ করে এর অভাব দূর করা যেতে পারে। $Fe^{+++}$ এবং $Fe^{++}$ আয়ন রূপে এটি উদ্ভিদ কতৃক পরিশোষিত হয়।

**জিঙ্ক :** জিঙ্ক খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন বলে উদ্ভিদে সাধারণত এর অভাব দেখা যায় না। তবে ইদানিং দেশের উত্তারঞ্চলে ধানের জমিতে এর অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অম্ল বেলে এবং কোনো কোনো সময় ক্ষারীয় মৃত্তিকায় জিঙ্কের অভাব দেখা দেয়ার সম্ভবনা বেশি। মৃত্তিকায় হেক্টর প্রতি ১০ কেজি $ZnSo_4$ প্রয়োগ করে অথব পাতায় সিঞ্চন করে সহজেই এর অভাব দূর করা যায়। মৃত্তিকায় জিঙ্কের আধিক্য উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর।

**ম্যাঙ্গানিজ :** উদ্ভিদে এর চাহিদার পরিমাণ খুব অল্প, তাই সাধারণত মৃত্তিকায় এর ঘাটতি দেখা যায় না। তবে মৃত্তিকায় ম্যাঙ্গানিজ সবসময় শোষণযোগ্য বা গাছের জন্য গ্রহণীয় অবস্থায় থাকে না। মৃত্তিকায় এটি প্রধানত অদ্রবণীয় অক্সাইড আকারে অবস্থান করে। উদ্ভিদ কেবলমাত্র দ্রবণীয় দ্বিযোজী ($Mn^{++}$) আয়ন শোষন করতে পারে। $p^H$ মান ৬.৫ এর কম এবং কম নিষ্কাশিত মৃত্তিকায় এটি সবচেয়ে বেশি শোষণযোগ্য অবস্থায় থাকে। কারণ এরূপ পরিবেশে ত্রি ও চতুর্যোজী ম্যাঙ্গানিজ দ্বিযোজী আকারে রূপান্তরিত হয় যা গাছ গ্রহণ করে থাকে। সুনিষ্কাশিত ও ক্ষারীয় মৃত্তিকায় এটি অলভ্য হয়ে যায়। এই জন্য মৃত্তিকায় বেশি চুন প্রয়োগ করলে ম্যাঙ্গানিজ শোষণযোগ্যতা কমে যায়। অন্যদিকে আবার অত্যধিক অম্ল মৃত্তিকা

থেকে চুয়ানো প্রক্রিয়ায় বের হয়ে যেতে পারে। মৃত্তিকায় $MnSO_4$ প্রায়োগ করে অথবা পাতায় এটি সিঞ্চন করে ম্যাঙ্গানিজের অভাব দূর করা যায়। মৃত্তিকায় ম্যাঙ্গানিজ আধিক্য উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর।

**বোরন :** এই মৌলটিও খুব কম পরিমাণে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজন। তাই সাধারণত মৃত্তিকায় এর অভাব খুব কমই দেখা যায়। মৃত্তিকার দ্রবণীয় বোরন সহজেই মৃত্তিকা থেকে চুয়ে বের হয়ে যেতে পারে। এজন্য বৃষ্টিবাদল এলাকার অম্ল ও বেলে ধরনের মৃত্তিকায় এর ঘাটতি দেখা যেতে পারে। ইহা $B_4O_7^=$ অথবা $H_2BO_3^=$ আয়ন আকারে উদ্ভিদ কর্তৃক পরিশোষিত হয়ে থাকে। অম্ল মৃত্তিকায় এটি প্রধানত $H_2BO_3^=$ আকারেই শোষিত হয়। ক্ষারীয় মৃত্তিকায় ক্যালসিয়াম একে অশোষণযোগ্য করে রাখে। $Na_2B_4O_7$ প্রয়োগ করে সহজেই বোরনের অভাব দূর করা যায়।

**মলিবডেনাম :** এটি তিন প্রকার অদ্রবণীয় অক্সাইড, যেমন $MoO_2$, $MoO_3$ এবং $Mo_2O_3$ আকারে মৃত্তিকায় অবস্থান করে। $MoO_3$ আকার কোনো কোনো ক্যাটায়নের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবণীয় $MoO_4^=$ আকারে রূপান্তরিত হয় এবং উদ্ভিদ কর্তৃক পরিশোষিত হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ $p^H$ মানে এটি উদ্ভিদের নিকট অধিক শোষণযোগ্য হয়। মৃত্তিকায় সাধারণত এর অভাব দেখা যায় না, তবে অভাব হলে হেক্টর প্রতি প্রায় ১০ গ্রাম সোডিয়াম বা অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রয়োগে এর অভাব দূর করা যায়।

**মৃত্তিকায় অপ্রধান বা গৌণ পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি :** অপ্রধান পুষ্টি উপাদানসমূহের জন্য ফসলাদির চাহিদা খুব কম হলেও এদের অভাবে ফসলের ফলন কমে যায়। সাধারণভাবে অধিকাংশ মৃত্তিকায় এদের অভাব দেখা যায় না তবে শত শত বছর ধরে ফসল জন্মানোর ফলে কোনো কোনো মৃত্তিকায় এদের অভাব দেখা দেয়া স্বাভাবিক, কারণ সার হিসেবে আলাদাভাবে এগুলো সাধারণত প্রয়োগ করা হয় না। এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত দুটি ব্যবস্থা অবলম্বন করে মৃত্তিকায় অপ্রধান পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি রোধ করা যায়—

১. মৃত্তিকায় নিয়মিত ও যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন, কারণ এতে সব অপ্রধান পুষ্টিই স্বল্প পরিমাণে বিদ্যমান থাকে।

২. মৃত্তিকার $p^H$ মান ৫ থেকে ৭·৫ এর মধ্যে রাখা প্রয়োজন। কারণ এই মানে সব পুষ্টিই উদ্ভিদের জন্য লভ্য অবস্থায় থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

# পানি নিষ্কাশন
(Drainage)

ফসলের আশানুরূপ ফসল লাভে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের সাবলীল বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকায় পরিমিত পরিমাণ পানির উপস্থিতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি উদ্ভিদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই জমি থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দ্রুত অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা রাখা একান্ত আবশ্যক। জমি থেকে এরূপ ক্ষতিকর অতিরিক্ত পানি অপসারণ করাকেই পানি নিষ্কাশন বলা হয়।

## বাংলাদেশে পানি নিষ্কাশনের গুরুত্ব

ভৌগোলিক অবস্থান, বিস্তীর্ণ ভূমি এবং বর্ষাকালের অত্যধিক বৃষ্টিপাতের কারণে এদেশে জলাবদ্ধতা সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের চাষযোগ্য জমির প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে কোনো না কোনো প্রকার পানি নিষ্কাশন সমস্যা রয়েছে। আমাদের দেশে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতির জন্য কৃষক মোটেই যত্নবান নয়, ফলে এদেশের অধিকাংশ জমির নিষ্কাশন ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নয়। মৃত্তিকার বাঞ্ছিত গুণাগুণ এবং এদের রক্ষণাবেক্ষণ আশানুরূপ ফলনের উপর যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সে সম্বন্ধে কৃষকদের আজ সচেতন হওয়া অত্যাবশ্যক। পাহাড়িয়া এলাকার ঢালু এবং উঁচু স্থানসহ বন্য-বহির্ভূত কিছু এলাকার নিষ্কাশন অবস্থা অনেকটা ভাল। বাংলাদেশের নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, ফরিদপুর, যশোর, নাটোর এবং সিরাজগঞ্জ জেলার অনেক হাওড়-বিল পানিবদ্ধতার জন্য অনাবাদী থেকে যায়। নদী ভরাট এবং স্থানীয় বৃষ্টিপাতের কারণে এসব স্থানে বর্ষাকালে পানিবদ্ধতা দেখা দেয়। হাওড়-বিল ছাড়াও এদেশের সমভূমিতে পানি দ্রুত অন্যত্র সরে যেতে পারে না। আমাদের দেশে সাধারণত অতিবৃষ্টি, ডোবা ও জলাভূমি, সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, অপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতির কারণে জমিতে পানিবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাসমূহে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির কারণে পানিবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

## অতিরিক্ত পানির ক্ষতিকর প্রভাব

সময়মতো জমি থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি সরিয়ে ফেলা সুষ্ঠু মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম প্রধান কাজ। আমাদের দেশে বর্ষাকালে প্রায়ই অধিক বৃষ্টিপাত এবং বন্যার

কারণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের জন্য বহু জমি লবণাক্ত পানিতে ডুবে যায়। এইসব অপ্রয়োজনীয় পানি জমি থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। জমি থেকে এই পানি সময়মতো সরিয়ে না ফেললে নিম্নলিখিত ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

**১. উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ :** জমিতে সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকলে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অবাধ বায়ু চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। পানিবদ্ধতা ঘটলে মৃত্তিকায় রন্ধ্রপরিসর বায়ুর পরিবর্তে পানিকণা দ্বারা পূর্ণ থাকে, ফলে অক্সিজেনের অভাবে শিকড়ের শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে এবং অবশেষে পঁচে যায়। শিকড়ের অভাবে গাছ প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানি গ্রহণ করতে পারে না বলে এর বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মরে যায়। গাছের শিকড় অঞ্চলে অক্সিজেনের অভাব হলে অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। গাছ খবাকৃতি হয় এবং পাতা ফ্যাকাসে সবুজ বা ঈষৎ হলুদ বর্ণ ধারণ করতে পারে। আখের ধসা রোগ এবং তুলার পাতা ও বোল ঝরা রোগ পানিবদ্ধতার কারণে হয়ে থাকে।

**২. মৃত্তিকা বুনটের অবনতি :** পানিবদ্ধতায় জমি মৃত্তিকার চাপে শক্ত হয়ে যায়। এরূপ মৃত্তিকায় কৃষিকাজ করা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

**৩. অগভীর মূল সৃষ্টি :** জমিতে পানিবদ্ধতা বা প্রয়োজনাধিক রসের জন্য গাছের শিকড় সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করতে পারে না। অতিরিক্ত পানির কারণে পানিতল উপরে উঠে আসে, ফলে শিকড় মৃত্তিকার নিচের দিকে বাড়তে পারে না। মৃত্তিকার উপরিস্তরের মধ্যেই এর বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে রৌদ্র-তাপে উপরের মৃত্তিকা শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনীয় রসের অভাবে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এ অবস্থা বেশি দিন চললে গাছ শুকিয়ে মরে যেতে পারে। মৃত্তিকার অধিকতর নিম্নস্তরে প্রচুর রস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অগভীর শিকড় সৃষ্টির কারণে গাছের তা কোনো কাজেই আসে না। যখন কোনো গাছ মৃত্তিকার উপর স্তরেই প্রয়োজনীয় রস ও পুষ্টি পায়, সে গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি তখন মৃত্তিকার উপরস্তরেই সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা দেখা যায়। মৃত্তিকার নিচস্তরে যেতে চায় না। রোপা আমন বা বোরো ধানের জমিতে সর্বদা উপর স্তরে প্রচুর রস থাকার জন্য অগভীর শিকড়ের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে উপর স্তরে পানির কমতির জন্য আউস বা উঁচু জমির ধানের শিকড় প্রায় গমের মতো গভীর বা লম্বা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে তুলা শ্রাবণ মাসে বপন করা হয়। এর প্রাথমিক বৃদ্ধিকাল শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে প্রায়ই বৃষ্টিপাত হওয়ায় দরুণ মৃত্তিকার উপর স্তরেই রস সর্বদা বিদ্যমান থাকে, ফলে তুলা গভীর মূলবিশিষ্ট (৭০-১৫০ সে.মি.) ফসল হওয়া সত্ত্বেও অনেক জমিতে এর শিকড় ২০-২৫ সে.মি. এর বেশি লম্বা হতে পারে না। এরূপ পরিস্থিতিতে পরবর্তীকালে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে থাকে।

**৪. উপকারী জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ব্যাহত :** অতিরিক্ত পানি বা পানিবদ্ধতার কারণে মৃত্তিকা কণার ফাঁকসমূহ বায়ুর পরিবর্তে পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে, ফলে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। অক্সিজেনের অভাবে উপকারী জীবাণুর ক্রিয়া ও বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং এর

জন্য জৈব পদার্থের স্বাভাবিক পচনক্রিয়া চলতে পারে না। অন্যদিকে কোনো কোনো সময় অপকারী জীবাণু বৃদ্ধি পেয়ে মৃত্তিকায় প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফলন হ্রাস পায়। এসব অপকারী জীবাণু গাছের অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টি নাইট্রোজেন নষ্ট করে ফেলে। এ ছাড়া অক্সিজেনের অভাবে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অনিষ্টকর পচনক্রিয়া সংঘটিত হয় যা গাছের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

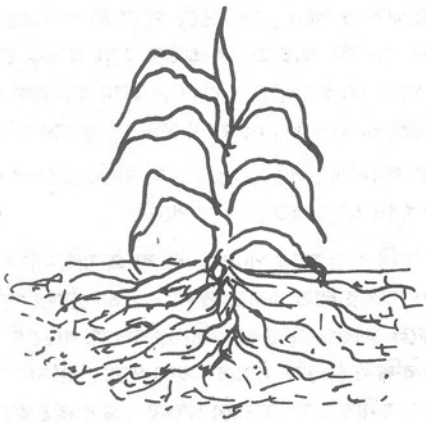

চিত্র ১০ ক : অতিরিক্ত সিক্ত জমিতে অগভীর শিকড় সৃষ্টি।

**৫. পুষ্টি উপাদান অলভ্য হওয়া :** সময়মতো অতিরিক্ত পানি অপসারণ না করলে উদ্ভিদ খাদ্যের অপচয় ঘটে এবং নষ্ট হয়ে যায়। পানিবদ্ধতার কারণে লভ্য নাইট্রেট ($NO_3^-$) নাইট্রাইটে ($NO_2^-$) এবং সালফেট ($SO_4^=$) সালফাইডে ($SO_3^=$) রূপান্তরিত হয়ে গাছের জন্য অলভ্য হয়ে ওঠে। নাইট্রোজেন এরূপ পানিবদ্ধ অবস্থায় গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে গিয়ে অপচয় হয়। পানিবদ্ধ মৃত্তিকায় বায়ু চলাচল বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ায় $H_2S$ গ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে যা গাছে বিষাক্ততা সৃষ্টি করে। পানিবদ্ধতা উঁচুশ্রেণীর উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর ডাই-হাইড্রক্সিস্টিয়ারিক এসিড সৃষ্টি করতে পারে।

**৬. মৃত্তিকার তাপমাত্রা হ্রাস :** মৃত্তিকার যথাযথ তাপমাত্রা বীজের অঙ্কুরোদগম, গাছের ক্রম বৃদ্ধি এবং জীব অণুজীবের স্বাভাবিক ক্রিয়া চালিয়ে যাবার জন্য অত্যাবশ্যক। জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়, মৃত্তিকা শীতল হয়ে যায়। শীতপ্রধান দেশে এরূপ অবস্থা কৃষিকার্যে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। আমাদের দেশেও অতিরিক্ত ঠাণ্ডা মৃত্তিকা বীজ অঙ্কুরোদগম এবং গাছ ও জীব-অণুজীবের উপর

প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ঠাণ্ডা মৃত্তিকার চেয়ে পরিমিত উষ্ণ মৃত্তিকায় পানির অনুপ্রবেশ হারও বেশি।

৭. **লবণাক্ততা বৃদ্ধি :** সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে কোনো কোনো এলাকায় বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার অতিরিক্ত পানির ক্ষতিকর দ্রবণীয় লবণাদি জমি থেকে সময়মতো দূরীভূত হতে পারে না। আবার বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের কারণে পানিতল উপরে উঠে আসতে পারে। এর ফলে উষ্ণ, শুষ্ক আবহাওয়ায় বাষ্পীভবনহেতু নিচের পানির সাথে সাথে দ্রবণীয় লবণও উপরে উঠে এসে গাছের শিকড় অঞ্চল এবং ভূ-পৃষ্ঠে জমা হতে থাকে। এর ফলে মৃত্তিকার ক্ষারত্ব আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং গাছপালার বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। তাই অধিক বৃষ্টিপাত, সেচ এবং উপকূলীয় অঞ্চলে জমিতে সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য।

৮. **জলাভূমির সৃষ্টি :** যে সমস্ত নিচু বা বন্ধুর এলাকায় কোনো প্রকার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই, সে সমস্ত এলাকার জমি অত্যধিক বৃষ্টিপাত বা জোয়ারের পানিতে কোনো কোনো সময় স্যাঁতস্যাতে জলাভূমিতে পরিণত হয়। সময়মতো এ সব জমির পানি অপসারণের ব্যবস্থা না করলে চাষাবাদ সম্ভব হয়ে ওঠে না।

৯. **শস্য উৎপাদন মৌসুম মাস :** জমিতে যেভাবেই অতিরিক্ত পানি জমা হোক না কেন, তা কৃত্রিম উপায়ে অপসারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তা না করলে স্বাভাবিক উপায়ে পানি সরে গিয়ে জমিতে 'জো' আসতে অহেতুক অনেক সময় লেগে যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় কোনো কোনো সময় জমিতে প্রয়োজনে আগাম এমনকি সময়মতোও ফসল চাষ সম্ভব হয় না, ফলে শস্য বৃদ্ধিকাল সীমিত হয়ে পড়ায় ফলন কমে যেতে পারে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট জমিতে পরবর্তী ফসলের বপন কার্যেও বিলম্ব ঘটতে পারে।

১০. **ক্ষয়ীভবন বৃদ্ধি :** পানিবদ্ধ ভূমিতে মৃত্তিকা চেপে যাবার দরুণ নিচের দিক পানিকণার অনুস্রবণ ধীর লয়ে ঘটে বলে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে উপরিমৃত্তিকার ক্ষয়ীভবনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

### যেসব জমিতে পানি নিষ্কাশন বিশেষ আবশ্যক

নদ-নদী বিধৌত বাংলাদেশের অধিকাংশ আবাদী জমির মৃত্তিকার বুনট উত্তম হলেও জমির অবিবেচক ও যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে জমির ভৌত গুণাগুণ এবং রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ার অবনতি ঘটছে। ফলে অনেক জমিতেই কোনো না কোনোভাবে পানিবদ্ধতার সৃষ্টির দরুণ হ্রাস ফলন পাচ্ছে। সূক্ষ্ম বুনটবিশিষ্ট নিচু এলাকার এঁটেলজাতীয় মৃত্তিকায় বিশেষ করে কৃত্রিম পানি নিষ্কাশনের বেশি প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। অতিরিক্ত পানি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গড়িয়ে বা অনুস্রবণ প্রক্রিয়ায় দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে গেলে শস্য উৎপাদনে তেমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু পানি দ্রুত অপসারিত না হলে, কাল বিলম্ব না করে নিচে উল্লেখিত জমিতে যেখানে স্বাভাবিক উপায়ে পানি অপসারণ সময়সাপেক্ষ, সেসব জমিতে অবশ্যই কত্রিম উপায়ে পানি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

**১. ভারী, এঁটেল মৃত্তিকাবিশিষ্ট জমি :** এ জাতীয় মৃত্তিকার কণা খুব সূক্ষ্ম বলে বুনটও খুব ঠাসা এবং শক্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে। এ মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা খুব কম। অনুস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি সহজে নিচ স্তরে চলে যেতে পারে না ফলে অল্প বৃষ্টিতেও পানিবদ্ধতা প্রকট হয়ে উঠতে পারে। এ জাতীয় জমি থেকে কৃত্রিম উপায়ে পানি অপসারণ না করলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে।

**২. বন্ধুর ভূমি ও জলাভূমি :** অসমতল জমির নিচু জায়গাতে (pockets) পানি জমলে ফসলের ক্ষতি হয়। তাছাড়া জলাভূমি একমাত্র যথোপযুক্ত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমেই আবাদযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, যশোর প্রভৃতি জেলার অনেক হাওড়-বিলে পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে বোরো ধান চাষ করা সম্ভব হচ্ছে।

**৩. কঠিন স্তরবিশিষ্ট জমি :** এ জাতীয় জমিতে পানি নিষ্কাশন খুবই প্রয়োজন। নিচে কঠিন স্তর (hard pan) বিদ্যমান থাকার কারণে অনুস্রবণ প্রক্রিয়ায় উপরের জমা পানি নিচে চুয়ে যেতে পারে না, ফলে গাছের শিকড়অঞ্চলে পানি জমে গাছের অশেষ ক্ষতিসাধন করে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে গভীর কর্ষণের মাধ্যমে কঠিন স্তর ভেঙে দিলে উপকার পাওয়া যায়। রোপা আমন ধানের জন্য অবশ্য জমিতে পানি ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কঠিন স্তরের প্রয়োজন হয়। তবে অন্যান্য ফসলের জন্য মৃত্তিকার ১৫-২০ সে.মি. নিচে কঠিন স্তরের উপস্থিতি খুবই ক্ষতিকর।

## অতিরিক্ত পানির উৎস এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা

বিভিন্ন উপায়ে জমিতে অতিরিক্ত পানির বা পানিবদ্ধতার সৃষ্টি হতে পারে। অত্যধিক বৃষ্টিপাত, অবিবেচক সেচ, নদী বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে জমিতে অতিরিক্ত পানির উৎসরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া মৃত্তিকার প্রতি অযত্ন ও অবহেলা, কাঁচা সেচ নালা, ভারী এঁটেল মৃত্তিকা, মৃত্তিকার কঠিন স্তর প্রভৃতি পরোক্ষভাবে জমিতে অতিরিক্ত পানি বা রসের কারণ হতে পারে। এইসব উৎস থেকে জমিতে পানি জমলে বা যাতে আদৌ জমতে না পারে, তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা কর্তব্য।

**১. নিষ্কাশন নালা নির্মাণ :** জমিতে প্রয়োজনীয় নিষ্কাশন নালা নির্মাণ করা সুষ্ঠু খামার ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান অংশ। যে কোনো উৎস থেকে জমিতে অতিরিক্ত পানি জমলে তা নিষ্কাশন নালার সাহায্যে দ্রুত নদী, খাল বা যে কোনো নিরাপদ স্থানে অপসারণ করা যেতে পারে।

**২. পাম্পের ব্যবহার :** বৃষ্টিপাত, জলোচ্ছ্বাস বা বন্যার দরুণ সৃষ্ট নিচু অতিরিক্ত পানি পাম্পের সাহায্যে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা যেতে পারে। এভাবে অনেক জমি পুনরুদ্ধার করে চাষোপযোগী করে তোলা যায়। গভীর বা অগভীর নলকূপের সাহায্যেও ভূ-গর্ভস্থ পানি উঠিয়ে পানিতল নিচে নামিয়ে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় পানি উপরে উঠে আসা বন্ধ করা যেতে পারে। এভাবে উত্তোলিত পানি প্রয়োজনে সেচকার্যে ব্যবহার করা যায়।

৩. **বাঁধ নির্মাণ :** নদী বা সমুদ্র থেকে জমিতে অতিরিক্ত পানি আসার সম্ভাবনা থাকলে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে তা রোধ করা যেতে পারে। ডাকাতিয়া নিকাশ প্রকল্প, চাঁদপুর পাইলট প্রকল্প, যমুনা বাঁধ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পের আওতায় বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্নের কবল থেকে রক্ষা করা হচ্ছে।

৪. **গতি পরিবর্তন নালা নির্মাণ :** অনেক সময় এ জাতীয় নালার সাহায্যে পানির গতিপথ পরিবর্তন করে জমিকে অতিরিক্ত পানির কবল থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

৫. **মৃত্তিকার সুষ্ঠু পরিচর্যা :** এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে কৃষক যদি সচেতন হয় তাহলে মৃত্তিকায় পানিবদ্ধতা সমস্যার অনেকটাই অতি সহজে সমাধান হয়ে যায়। বিভিন্ন পরিচর্যার মাধ্যমে জমি এমনভাবে সমতল করে প্রস্তুত করা উচিত যাতে জমির উপর অতিরিক্ত পানি জমা হয়ে থাকতে না পারে অথবা অনুস্রবণ প্রক্রিয়ায় দ্রুত শিকড় অঞ্চলের নিচে চলে যেতে পারে। ভারী, এঁটেল মৃত্তিকায় সহজেই পানি জমতে পারে। এরূপ মৃত্তিকায় প্রয়োজনীয় জৈব সার প্রয়োগ করে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতি করে এর অনুস্রবণ ক্ষমতা আশানুরূপ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে জমির কঠিন স্তর গভীর কর্ষণের মাধ্যমে ভেঙে দিলে অতিরিক্ত পানি সহজেই শিকড় অঞ্চলের বাইরে চলে যেতে পারে। জমিতে সঠিক আর্দ্রতায় অর্থাৎ 'জো' মতো কর্ষণ জমির বাঞ্ছিত বুনট রক্ষার প্রধান উপায়। 'জো' মতো কর্ষিত জমির মৃত্তিকা কণা দানাদার, ঝুরঝুরে হয়। এরূপ মৃত্তিকার পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বেশ বৃদ্ধি পায়।

৬. **পাকা সেচনালা নির্মাণ :** কাঁচা সেচ নালার গা চুয়ে পানির যেমন অপচয় হয় তেমনি অতিরিক্ত পানির কারণে নিচু জমির পানিতল উপরে উঠে আসার ফলে জমি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়। এরূপ অবস্থা শস্য চাষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। আমাদের দেশে গঙ্গা–কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের কাঁচা সেচনালা অনেক আবাদী জমি এইভাবে নষ্ট করছে। পাকা সেচ নালার মাধ্যমে এরূপ অতিরিক্ত পানির কবল থেকে জমি রক্ষা করা যায়। এ ছাড়া যথাযথ পরিমাণ পানি সেচ কাজে ব্যবহার করেও এরূপ অবস্থা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব।

## পানি নিষ্কাশনের উদ্দেশ্য বা উপকারিতা

ফসলের জমি থেকে সময়মতো পানি নিষ্কাশন মৃত্তিকা তথা ফসলের নানাবিধ উপকার সাধন করে থাকে। বিচক্ষণতার সাথে ফসলের জমি থেকে সুষ্ঠুভাবে পানি অপসারণ করলে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হয়ে থাকে—

১. **গাছের সতেজতা বৃদ্ধি এবং রোগ–বালাই নিয়ন্ত্রণ :** জমি থেকে অতিরিক্ত পানি অপসারণ করলে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের এবং রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়া উন্নত হওয়ার ফলে মৃত্তিকায় উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এতে উদ্ভিদ সবল, সতেজ হয়ে বাড়তে পারে এবং রোগ–বালাইয়ের আক্রমণ কম হয়ে থাকে।

২. **গভীর শিকড়ের সৃষ্টি :** মৃত্তিকায় ঠিকমতো বায়ু চলাচল করতে পারলে এবং পরিমিত রস থাকলে শিকড়ের ব্যাপক বৃদ্ধিসাধন ঘটে থাকে। মৃত্তিকা যদি সবসময় সিক্ত থাকে তাহলে এর উপরিস্তরে শিকড়ের বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সীমিত হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে যখন খরা দেখা দেয় তখন এই অগভীর শিকড় মৃত্তিকার নিম্নস্তর থেকে রস সংগ্রহ করতে সক্ষম না হওয়ায় গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে থাকে। অন্যদিকে সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশিত মৃত্তিকায় শিকড় গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং বিস্তৃতিও ঘটে প্রচুর। ফলে এ অবস্থায় উদ্ভিদ মৃত্তিকার গভীরস্তর থেকে রস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এই কারণে এরা খরা সহনশীল হয় এবং অনাবৃষ্টির সময়ও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে (চিত্র ১০ দ্রষ্টব্য)।

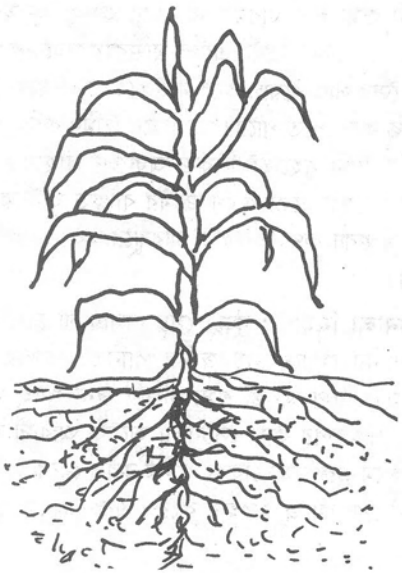

চিত্র ১০ খ : সুষ্ঠু নিষ্কাশিত জমিতে গভীর শিকড় সৃষ্টি

৩. **উপকারী অণুজীবের বংশ ও ক্রিয়া বৃদ্ধি :** অতিরিক্ত পানি সময়মতো অপসারণ করলে মৃত্তিকার রন্ধ্রপরিসরে প্রচুর বায়ুর উপস্থিতি ও চলাচল উপকারী জীবাণুর বংশ এবং ক্রিয়া বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এরা জৈব পদার্থ বিযোজনের মাধ্যমে নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য খাদ্যোপাদন দ্রুত গাছের গ্রহণোপযোগী করে তোলে। এরূপ অনুকূল পরিবেশ গাছের জন্য লভ্য $NO_3^-$ এবং $NO_4^=$ আয়ন অলভ্য আকারে পরিবর্তিত হতে পারে না। তাছাড়া অক্সিজেনের উপস্থিতির জন্য কোনোরূপ ক্ষতিকর পচনক্রিয়াও সংঘটিত হতে পারে না।

৪. **মৃত্তিকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি :** জমির অতিরিক্ত পানি দ্রুত সরিয়ে ফেললে মৃত্তিকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকার বাঞ্ছিত তাপমাত্রা, অণুজীবের কর্মকাণ্ড, বীজের অঙ্কুরোদ্গম, শিকড় ও গাছের ক্রমবৃদ্ধির জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

৫. **মৃত্তিকার লবণাক্ততা হ্রাস :** যে সব জমির উপরে অথবা গাছের শিকড় অঞ্চলে লবণ জমার প্রবণতা থাকে সে সব জমিতে সময়মতো অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুযোগ থাকতে হবে। অতিরিক্ত পানি অপসারণের সাথে দ্রবণীয়, ক্ষতিকর লবণাদি দূরীভূত হয়ে যায়। মৃত্তিকার অনুস্রবণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেলে পানির সাথে লবণও নিচের দিকে শিকড় অঞ্চলের বাইরে চলে যেতে পারে। সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা পানিতল অধিকতর নিচে নামিয়ে দেয়, ফলে বাষ্পীভবন দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে লবণ উঠে এসে জমা হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। অধিকাংশ মেঠো ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য ভূ-পৃষ্ঠের ২ মিটার নিচে পানিতল থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬. **জলাভূমি চাষোপযোগীকরণ :** পানি দ্রুত অপসারণ করলে নিচু বা অসমতল জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না। এর ফলে এসব নিচু জমিতেও সময়মতো চাষ করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

৭. **শস্য উৎপাদন মৌসুম দীর্ঘকরণ :** সময়মতো অতিরিক্ত পানি অপসারণ করলে জমিতে তাড়াতাড়ি 'জো' আসে, ফলে আগাম বা সময়মতো জমি প্রস্তুত করা ও শস্য বপন করা সম্ভব হয়ে উঠে। এ অবস্থায় ফসল তার বৃদ্ধির জন্য যথাযথ সময় পায় এবং পরবর্তী শস্য চাষের সময়ের উপরও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। তাছাড়া সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে অধিক বৃষ্টিপাতের সময়ও ফসলের পরিচর্যা সময়মতো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। আউশ, পাট, তুলা প্রভৃতি শস্যের জমি থেকে সময়মতো অতিরিক্ত পানি বের করে দিয়ে জমিতে দ্রুত 'জো' এনে বিভিন্ন পরিচর্যা বিশেষ করে আগাছা দমনের মাধ্যমে গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা সম্ভব।

৮. **মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবন হ্রাস :** পানি নিষ্কাশনের কারণে মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতি ঘটে। সুনিষ্কাশিত জমিতে পানির অনুপ্রবেশ এবং অনুস্রবণ ঠিকমতো হয় বলে মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবনও হ্রাস পেয়ে থাকে। এরূপ জমিতে মৃত্তিকা কণার দানাবন্ধন দৃঢ় হওয়ার ফলে পানির সাথে গড়িয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে মৃত্তিকা কণার অপসারণ কম হয়।

নবম অধ্যায়

# ভূমিক্ষয়
(Soil Erosion)

মৃত্তিকা গাছপালা জন্মানোর একমাত্র অবলম্বন। মৃত্তিকা ছাড়া অন্য কোনো অবলম্বনের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গাছপালা জন্মানো সম্ভব নয় এবং আর্থিক দিক থেকেও তা বাঞ্ছিত নয়। মৃত্তিকা কৃষি কর্মকাণ্ডের প্রথম এবং প্রধান সম্পদ। কৃষির উন্নতি লক্ষ্যে এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। মৃত্তিকার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ করে উপরের সবচেয়ে উর্বরস্তর ক্ষয় রোধে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কৃষকদের সচেতন করে তোলার কোনো ব্যবস্থাই নেই। ফলে অজ্ঞতার কারণে বাংলাদেশের অতি উর্বর মৃত্তিকা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে দিন দিন অনুর্বর ও শস্য চাষের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। আমেরিকার মতো উন্নত দেশেও মাত্র ১৯৪৫ সন থেকে শস্য উৎপাদনক্ষম মৃত্তিকার ক্ষয় রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়। এখানে ফসলী জমি থেকে বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা প্রতি বছর হেক্টরে ১৫–২০ টন মৃত্তিকা ক্ষয় হয়। বাংলাদেশের প্রায় ফসলী জমি সমতল ভূমির অন্তর্গত। দেশের পূর্ব–দক্ষিণের কিছু পাহাড়ী এলাকা এবং নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী কিছু এলাকা ছাড়া ভূমিক্ষয় তেমন প্রকট না হলেও গোচরে এবং অগোচরে সংঘটিত ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ মোটেই অবহেলা করার মতো নয়। বাংলাদেশে স্বাধীনপূর্বকালে "ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দিনাজপুর জেলায় দেবীগঞ্জ এলাকার হাল্কা মৃত্তিকা বায়ুজনিত ক্ষয়ের হাত থেকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জমিতে সবুজ সার প্রয়োগ করে মৃত্তিকার জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন করে জমির উপরিভাগ সারা বছর ঢেকে রেখে বায়ুজনিত ক্ষয়রোধই এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের এ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদটির ক্ষয়রোধকল্পে কিছু কিছু বাধা ছাড়া আর কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাই ভূমিক্ষয় এবং এর নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

## ভূমিক্ষয়

ভূমি থেকে যে কোনো প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা আলগা হয়ে স্থানান্তরিত হওয়াকে ভূমিক্ষয় বলা হয়। ভূমিক্ষয় প্রকৃতিগতভাবে দু'প্রকার, যথা ১. প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় ও ২. ত্বরান্বিত ভূমিক্ষয়।

**১. প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় :** এরূপ ভূমিক্ষয় পৃথিবীতে মৃত্তিকা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এরূপ ভূমিক্ষয় সংঘটিত হয়ে থাকে। এটি একদিকে যেমন পৃথিবীর উচ্চ ভূ–অঞ্চলে নানাভাবে ধ্বংসের কাজ চালায়, অন্যদিকে

আবার নিম্নভূমিতে নরম, উর্বর উপত্যকা সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীকে শস্য-শ্যামল করে তোলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরূপ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বহু উর্বর ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ ভূমিক্ষয় এত ধীরে ধীরে চলতে থাকে যে তা মানুষের গোচরেই আসে না। প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয়ের প্রভাবে ধ্বংস এবং সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য থেকে যায় যে, এর ফলে পৃথিবীর পরিবেশে সাধারণত কোনো প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় না।

**২. ত্বরান্বিত ভূমিক্ষয় :** মানুষ ও জীবজন্তুর কর্মকাণ্ডের ফলে প্রকৃতিতে ভূমিক্ষয়ের মাত্রা যখন বেশি বৃদ্ধি পায় তখন একে ত্বরান্বিত ভূমিক্ষয় বলা হয়। যথেচ্ছাভাবে গাছপালা ধ্বংস, অপরিকল্পিত চাষাবাদ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি এরূপ ভূমি ক্ষয়ের প্রধান কারণ।

মানুষ ভালভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে যখন বনজঙ্গল কেটে কৃষি ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে থাকে, যথেচ্ছাভাবে গরু-মহিষ চরিয়ে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির উপরিভাগ উন্মুক্ত করে তোলে, তখন থেকেই এরূপ ত্বরান্বিত ভূমিক্ষয় শুরু হয়। এখানেই এর শেষ নয়, কৃষি জমিতে প্রয়োজনীয় সার, জৈব পদার্থ প্রয়োগ না করে, চাষাবাদের জন্য জমি সমতল না করে, পর্যায়ক্রমে ফসল চাষ না করে মানুষ বছরের পর বছর ফসল জন্মাতে লাগলো, ফলে মৃত্তিকার উপরিভাগে ভূমিক্ষয় প্রকট হয়ে উঠলো। দেখা গেল, জমিতে আর ফসল মোটেই ভাল হচ্ছে না। মৃত্তিকার বুনট ও গঠন নষ্ট হয়ে গেছে। জমি এদিক-ওদিক নালা-খন্দে ভরে গেছে। মানুষের সৃষ্ট এই ভূমিক্ষয়ের ফলে পৃথিবীর বহু উর্বর এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। অনেক সভ্যতা মৃত্তিকার বুক থেকে মুছে গেছে। এভাবেই ইরান, সিরিয়া, ইরাক ও মিশরের বহু এলাকা মরুভূমি ও বালিয়াড়িতে পরিণত হয়েছে। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা এবং মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা এভাবেই একদিন পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে।

## ভূমিক্ষয় শ্রেণীবিভাগ

ভূমিক্ষয় প্রধানত পানি এবং বায়ু দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। এই দুটি নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে ভূমি ক্ষয়কে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ১. পানিজনিত ভূমিক্ষয় এবং ২. বায়ুজনিত ভূমি ক্ষয়।

**১. পানিজনিত ভূমিক্ষয় :** পানির চলাচলের প্রভাবে যে ভুমিক্ষয় হয়ে থাকে তাকে পানিজনিত ভূমিক্ষয় বলা হয়। এইরূপ ভূমিক্ষয়কে আবার ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা (ক) আস্তরণ বা পাত ভূমিক্ষয়, (খ) রিল ভূমিক্ষয়, (গ) নালা বা নালী ভূমিক্ষয়, (ঘ) কূল ভূমিক্ষয় এবং (ঙ) ধস ভুমিক্ষয়।

**ক. আস্তরণ ভূমিক্ষয় :** বৃষ্টি অথবা সেচের অতিরিক্ত পানি যখন জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় তখন জমির উপরিভাগ থেকে নরম উর্বর মৃত্তিকা কণা একটা পাতলা আবরণের ন্যায় উঠে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। পাতলা পাতের মতো মৃত্তিকার এরূপ স্থানান্তরিত হওয়াকে আস্তরণ ভূমিক্ষয় বলে। সমতল জমির চেয়ে ঈষৎ ঢালু জমিতে এরূপ ভূমিক্ষয় অধিক

পরিমাণে সংঘটিত হয়ে থাকে। বৃষ্টি বা সেচের ঘোলা পানি যা জমি থেকে বের হয়ে আসে তা জমির মৃত্তিকা কণা মিশ্রিত পানি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আস্তরণ বা পাত ক্ষয়ে জমির উপরিভাগের উর্বর মৃত্তিকা প্রায় সবস্থান থেকেই এমন সমানভাবে উঠে যায় যে মৃত্তিকার আদৌ কোনো ক্ষয় হয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। কিন্তু অবাধে বা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে মৃত্তিকার এরূপ ক্ষয় বছরের পর বছর চলতে থাকলে পরিশেষে জমির উর্বর মৃত্তিকা অনুর্বর হয়ে শস্য চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

**খ. রিল ভূমিক্ষয় :** একে পাত ভূমিক্ষয়ের দ্বিতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে। এ পর্যায়ে জমির উপরিভাগে লম্বাকৃতি রেখার ন্যায় সরু সরু নালার সৃষ্টি হয়। এইসব সরু নালা পানি চলাচলের বেগে ধীরে ধীরে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় বড় হয়ে বড় বড় মোটা নালার সৃষ্টি করে। এর ফলে জমি অসমতল হয়ে যায় এবং এরূপ জমিতে কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। বস্তুত এরূপ জমিতে ফসল উৎপাদন করার আয়তন কমে আসে। এর ফলে একর প্রতি উৎপাদন এবং জমির মোট উৎপাদন হ্রাস পায়।

**গ. নালী ভূমিক্ষয় :** রিল ভূমিক্ষয় অবাধে চলতে থাকলে ছোট ছোট নালাগুলো প্রতি বছর ক্ষয়ে ক্ষয়ে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে বিস্তীর্ণলাভ করে বড় বড় নালার সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় ভূমিক্ষয়কে নালী ভূমিক্ষয় বলে। কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে বৃষ্টির পানি যখন এই সমস্ত নালার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন সেগুলোর পার্শ্ব ও তলদেশের মৃত্তিকা কণা অধিকহারে বিযুক্ত হয়ে স্থানান্তরিত হয় এবং বৃহদাকার নালার সৃষ্টি করে। এ সব নালা তখন ছোট ছোট স্রোতস্বিনীর মতো দেখায়। বৃষ্টিপাতরে পরিমাণ অত্যধিক হলে কয়েক বছরের মধ্যে এরূপ অনেক নালার সৃষ্টি হয়ে ফসলী জমি আবাদ অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে।

**ঘ. কূল ভূমিক্ষয় :** প্রবল স্রোতের বেগ, ঢেউ বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে নদীকূল বা সমুদ্রকূল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও ভেঙে যায়। নদীতে জোয়ার শুরু ও শেষ হওয়ার সময় এরূপ ভাঙনের গতি তীব্রতর হয়, ফলে নদীতীরের বহু কৃষিজমি, চারণভূমি ও ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে এরূপ ভূমিক্ষয় চাষীদের নিকট খুবই পরিচিত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, গঙ্গা, গড়াই, সুরমা প্রভৃতি নদীর কূল ভাঙনে প্রতি বছর অনেক আবাদী জমি ও বসতভিটা হারিয়ে চাষীরা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কোনো কোনো সময় রেলপথ, রাস্তাঘাট, হাটবাজার, বিদ্যালয় প্রভৃতিও এরূপ ভাঙনের ফলে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সামুদ্রিক ঢেউ ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে বঙ্গোপসাগরের অদূরবর্তী সন্দ্বীপ, হাতিয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালি প্রভৃতি দ্বীপের উপকূলভাগ এভাবেই প্রতি বছর ক্ষয় হয়ে চলেছে।

**ঙ. ধস ভূমিক্ষয় :** অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ী এলাকার শিথিল বন্ধন মৃত্তিকা একসাথে বড় এলাকাজুড়ে স্থানান্তরিত হয়। মৃত্তিকার এরূপ স্থানান্তরিত হওয়াকে ধস ভূমিক্ষয় বলা হয়। আমাদের দেশের বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের সময় পাহাড়ের গা থেকে এরূপ ধস নেমে রাস্তাঘাট ও জানমালের অনেক ক্ষতিসাধন করে থাকে।

**২. বায়ুজনিত ভূমিক্ষয় :** গতিশীল বায়ুর প্রভাবে জমির মৃত্তিকা স্থানান্তরিত হওয়াকে বায়ুজনিত ভূমিক্ষয় বলে। পৃথিবীর যে সব অঞ্চল তুলনামূলকভাবে সমতল, গাছপালার সংখ্যা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম, সেসব অঞ্চলেই এরূপ ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ খুব বেশি। তাছাড়া হাল্কা, বেলে মৃত্তিকায় বায়ুজনিত ভূমিক্ষয় কোনো কোনো সময় প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। প্রবল বেগে প্রবহমান বায়ু বা ঝড়-ঝঞ্ঝা জমির উপরিভাগের শুষ্ক, আলগা মৃত্তিকা কণা সহজেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। জমির উপরিভাগ যদি উন্মুক্ত থাকে এবং তাতে জৈব পদার্থ ও রসের পরিমাণ যদি কম হয়, তাহলে এ অবস্থায় মৃত্তিকা কণা অতি সহজেই বায়ু প্রবাহে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উড়ে যায়। জমির উপরিস্তরের উর্বর মৃত্তিকা এভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে নিচের অনুর্বর মৃত্তিকা উপরে বের হয়ে আসে। এ অবস্থা কোনো এক সময়ে উর্বর মৃত্তিকাকে এক নগ্ন মৃত্তিকায় রূপান্তর করে ফেলে যেখানে গাছপালা আর তেমন ভালভাবে জন্মিতে পারে না।

বায়ুজনিত ভূমিক্ষয়ের কর্মকাণ্ড এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রবলবেগে প্রবাহমান বায়ু শত শত কিলোমিটার দূর থেকে বালুকারাশি উড়িয়ে নিয়ে এসে উর্বর মৃত্তিকা অঞ্চল সম্পূর্ণ ঢেকে বালির উঁচু ঢিপি বা বালিয়াড়ির সৃষ্টি করে। এতে চাষের উর্বর জমি সম্পূর্ণভাবে চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অনেক সময় তীব্র বেগে বহমান বালি কণার আঘাতে দণ্ডায়মান ফসলের অশেষ ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় উড়ে আসা বালিতে চারা অবস্থায় ফসলের গাছ ঢেকে যায় এবং এ অবস্থায় ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার কোনো কোনো এলাকার হাল্কা, বেলে মৃত্তিকা কণা চৈত্র-বৈশাখ মাসের প্রবল বায়ুর বেগে অন্যত্র উড়ে যায়, ফলে এরূপ আক্রান্ত জমির উর্বরতা যথেষ্ট কমে যায় এবং পরিণামে ফলন হ্রাস পায়।

### ভূমিক্ষয়ের কারণ

ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ পানি ও বায়ু যা উপরে আলোচনা করা হলো। এ দুটি ছাড়াও আরো অনেক কারণে ভূমিক্ষয় সংঘটিত হয়ে থাকে। নিচে ভূমিক্ষয়ের সমস্ত কারণগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে—

**১. বৃষ্টিপাত :** ভূমিক্ষয়ের সর্বপ্রধান কারণ হলো বৃষ্টিপাত। এর তীব্রতা, সংখ্যা এবং পরিমাণ সরাসরি ভূমিক্ষয়ের মাত্রাকে প্রভাবিত করে থাকে। বড় আকারের বৃষ্টির ফোটা মৃত্তিকা সজোরে আঘাত করলে মৃত্তিকা কণা বিযুক্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পরে এবং প্রবহমান বৃষ্টির পানির সাথে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। বৃষ্টি ধীরে ধীরে হয় এবং ফোটাও যদি ছোট আকারের হয়, তাহলে মৃত্তিকা কণার বিযুক্তি কম হয় এবং পানিও মৃত্তিকা অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের সময় পায়, ফলে বৃষ্টিজনিত ক্ষয় জমির তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। ঘন ঘন এবং অনেক সময় ধরে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে মৃত্তিকার শোষণ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়, বিশেষ করে ভারী, কাদাজাতীয় মৃত্তিকায় এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। এরূপ অবস্থায় অতিরিক্ত পানির সাথে বিযুক্ত মৃত্তিকা কণা মিশে জমির উপর

দিয়ে গড়িয়ে নিচের দিকে ধাবিত হয়। এই ধাবমান পানির সাথে ভূমির উপরিস্তরের আলগা, নরম মৃত্তিকা স্থানান্তরিত হতে থাকে। প্রবহমান পানির বেগ যতো বেশি হয় উপরি মৃত্তিকার ক্ষয়ও ততো বেশি হয়ে থাকে।

২. **ভূমির ঢাল :** ভূমির ঢাল মৃত্তিকা ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। যে জমি যতো বেশি ঢালু এবং ঢালের দৈর্ঘ্যও বেশি, সে জমির মৃত্তিকাক্ষয়ও ততো বেশি হয় কারণ অধিকতর ঢালু জমিতে প্রবহমান পানির বেগও অধিক হয়ে থাকে। ঢালু জমির মৃত্তিকা পানি শোষণ করার সময়ও খুব কম পায়, ফলে দ্রুতগতিতে ধাবমান পানি জমির মৃত্তিকা ধুয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। তাই পাহাড়ী জমিতে মৃত্তিকা ক্ষয়ের সমস্যা প্রকট। পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির উপজাতীয় অধিবাসীরা পাহাড়ের গা পরিষ্কার করে যে পদ্ধতিতে ঝুম চাষ করছে তাতে এক বছর ফসল চাষের পর উন্মুক্ত পাহাড়ের উপরিস্তরের উর্বর মৃত্তিকা ধুয়ে নিচে ঝরণার সাথে মিশে যায়, ফলে পরবর্তী ৩–৪ বছর পাহাড়ের এসব ঢালে শস্য চাষ আর মোটেই লাভজনক হয় না। জমির ঢাল ফসল উৎপাদনে বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জমির ঢাল অনুপাতে মৃত্তিকা ক্ষয় ও ফলন কম বেশি হয়। সাভানা অঞ্চলে FAO পরিচালিত একটি পরীক্ষায় জানা যায় যে, জমির ঢাল কম হলে হেক্টর প্রতি ভুট্টার ফলন ২৭ টন এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রায় ৪ টন হয়। পক্ষান্তরে ঢাল বেড়ে গেলে ফলন হ্রাস পেয়ে ৯ টন এবং মৃত্তিকা ক্ষয় বৃদ্ধি পেয়ে ১২ টনে দাঁড়ায় (চিত্র ১১ দ্রষ্টব্য)।

৩. **মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য :** মৃত্তিকা বুনট, কণার সংযুক্তি বা দানাবন্ধন এবং জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর মৃত্তিকা ক্ষয় বহুলাংশে নির্ভর করে। হাল্কা, দানাদার এবং জৈব পদার্থযুক্ত মৃত্তিকা বেশ সচ্ছিদ্র বলে বৃষ্টির পানি সহজেই শোষিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে চলে যায়, ফলে অনেক সময় ধরে অত্যধিক বৃষ্টিপাত না হলে এরূপ মৃত্তিকায় বৃষ্টির পানি জমে ঢালুর দিকে গড়িয়ে যায় না, ফলে ক্ষয়ীভবন হ্রাস পায়। তবে শুষ্ক অবস্থায় এরূপ মৃত্তিকার কণা বায়ুর সাহায্যে সহজেই স্থানান্তরিত হতে পারে। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ভারী, এঁটেলজাতীয় মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা কম বলে পানি সহজে চুয়ে নিচের দিকে প্রবেশ করতে পারে না, ফলে অল্প বৃষ্টিপাতেই জমির উপরে পানি জমে তা ঢালুর দিকে ধাবিত হওয়ার সময় উপরিস্তরের উর্বর মৃত্তিকা বহন করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে কাদা ও হিউমাসের দরুণ ভারী মৃত্তিকা কণার পরস্পর সংযুক্তি ক্ষমতা বেশি বিধায় প্রবাহমান পানি সহজে এদের ধুয়ে নিতে পারে না। তাছাড়া এ জাতীয় মৃত্তিকা শুকিয়ে গেলেও বায়ু সহজে এদের উড়িয়ে নিতে পারে না। তবুও কোনো কোনো সময় ভারী মৃত্তিকাতেও ভূমিক্ষয় বেশি হয়ে থাকে। এর কারণ হলো বৃষ্টির ফোটা যদি খুব বড় হয় এবং অবিরাম প্রবলবেগে বর্ষণ হতে থাকে তখন বৃষ্টির বড় বড় ফোটার আঘাতে বিচ্যুত মৃত্তিকা কণা পানির সাথে স্থানান্তরিত হয়ে ক্ষয় বৃদ্ধি করে থাকে। তাছাড়া উন্মুক্ত, সমতল জমিতে বায়ু ও বৃষ্টিপাতজনিত কারণে মৃত্তিকা কণা অধিক পরিমাণে উড়ে বা ধুয়ে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে উন্মুক্ত মৃত্তিকা কর্ষণ করে রাখলে মৃত্তিকা ক্ষয় কমিয়ে আনা যায়।

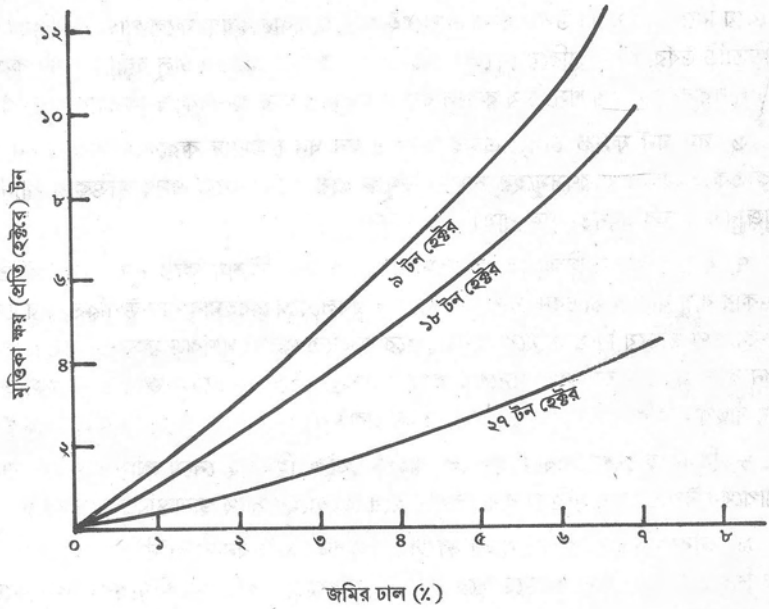


চিত্র ১১ : জমির ঢালের সাথে মৃত্তিকা ক্ষয়ের সম্বন্ধ

৪. **শস্যের প্রকার :** বিচক্ষণতার সাথে শস্য নির্বাচন করে মৃত্তিকা ক্ষয় অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। চীনাবাদাম, খেশারি, বরবটি, সয়াবিন প্রভৃতি পত্রবহুল শস্য দ্বারা মৃত্তিকা সম্পূর্ণ ঢেকে রেখে পানি বা বায়ুজনিত মৃত্তিকাক্ষয় থেকে জমি রক্ষা করা যায়। অন্যদিকে সারিতে বপনকৃত আখ, ভুট্টা, তুলা প্রভৃতি ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি মৃত্তিকা ক্ষয়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এসব ক্ষেত্রে গাছ কিছুটা ঘন বপন করে ক্ষয়ীভবন হ্রাস করা সম্ভব। তাছাড়া লন, বাঁধ প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা ক্ষয়রোধে দুর্বা ও চাপড়াজাতীয় ঘাস খবুই কার্যকরী। এসব গাছ মৃত্তিকা ঢেকে রেখে এবং গুচ্ছমূল দিয়ে মৃত্তিকা কণা আঁকড়ে ধরে মৃত্তিকা কণা স্থানান্তর বাঁধা দেয়।

৫. **জমি চাষ পদ্ধতি :** জমির বন্ধুরতা ও প্রকৃতি না বুঝে জমি কর্ষণ করলে উপরিস্তরের উর্বর মৃত্তিকার ক্ষয়সাধন বেশি হয়ে থাকে। অসমতল বিশেষ করে পাহাড়ী

জমিতে ঢালের আড়াআড়ি চাষাবাদ না করে যদি ঢাল বরাবর চাষ করা হয় তাহলে মৃত্তিকা ক্ষয় খুব বেশি হয়। বেশি খাড়া বা ঢালু জমিতে ধাপে ধাপে জমি চাষাবাদ না করে সমতল ভূমির ন্যায় প্রচলিত নিয়মে জমি চাষ করে ফসল করলে উপরের মৃত্তিকা সসহজেই পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে ধুয়ে যায়। উপজাতীরা এভাবেই জমি চাষাবাদ করার ফলে পাহাড়ী মৃত্তিকা খুব তাড়িতাড়ি উর্বরা শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া ঢালু জমির ক্ষেত্রেও ঢালু বরাবর কর্ষণ করলে বা ঢালু বরাবর সারিতে শস্য চাষ করলে বৃষ্টিপাতজনিত ক্ষয় আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়।

৬. **ঘন ঘন ফসল চাষ :** একই জমিতে ঘন ঘন চাষাবাদ করলে মৃত্তিকাও ঘন ঘন প্রাকৃতিক ভূমিক্ষয় কারণসমূহের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে এসব মৃত্তিকার পানি ও বায়ুজনিত ক্ষয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৭. **বায়ু :** বায়ু ভূমিক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বিশেষ করে শুষ্ক, বেলেজাতীয় মৃত্তিকার বায়ু দ্বারা ক্ষয়ীভবন বেশি হয়ে থাকে। প্রবলবেগে প্রবহমান বায়ু উপরিভাগের উর্বর মৃত্তিকা কণা উড়িয়ে নিয়ে জমিকে অনুর্বর করে ফেলতে পারে। ঘূর্ণিঝড় ফসলরে প্রভূত ক্ষতি সাধন করে থাকে। তবে বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ু, দোঁআশ-এঁটেল জাতীয় মৃত্তিকা এবং প্রচুর গাছপালার কারণে বায়ুজনিত ক্ষয় তেমন প্রকট নয়।

৮. **হিমবাহ :** শীতপ্রধান অঞ্চলে পাহাড় থেকে হিমবাহ নেমে আসার সাথে সাথে যাত্রাপথের উপরিস্তরের মৃত্তিকা কণা আলগা হয়ে হিমবাহের সাথে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

৯. **অবিবেচিতভাবে গাছপালা ধ্বংস :** গাছপালা এবং বনজঙ্গল মৃত্তিকা আবৃত রেখে এবং শিকড় মৃত্তিকা কণা আকড়ে ধরে পানি ও বায়ু ক্ষয়ের হাত থেকে মৃত্তিকা রক্ষা করে। কিন্তু মানুষজন অবিবেচিত ও যথেচ্ছভাবে গাছপালা কেটে মৃত্তিকা উন্মুক্ত করে ফেলে। এর ফলে সাথে সাথে উন্মুক্ত মৃত্তিকায় ক্ষয়ীভবনের কাজ শুরু হয়।

১০. **জীবজগতের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ :** মানুষ তরান্বিত ভূমিক্ষয়ের জন্য প্রধানত দায়ী। স্বাভাবিক অবস্থায় বন-জঙ্গল বা মাঠ-ঘাটে সাধারণত মৃত্তিকা ক্ষয় হয় না। মানুষ যখন বনজঙ্গলের গাছপালা অপরিকল্পিতভাবে কাটা শুরু করে, তখন মৃত্তিকার আচ্ছাদন সরে গিয়ে এটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, গাছের গোড়ার মৃত্তিকা আলগা হয়ে যায় এবং তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবন শুরু হয়। গোচারণ ভূমিতে যথেচ্ছা গো-মহিষ, ছাগল-ভেড়া চারণের ফলে মৃত্তিকা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। কোনো কোনো জায়গায় আবার খাল-খন্দের সৃষ্টি হয়। এভাবে উন্মুক্ত মৃত্তিকায় ক্ষয়ের কাজ শুরু হয়। বনজঙ্গল এবং তৃণাঞ্চলে মানুষ এবং গরু-ছাগলের হাঁটাহাটি ও চলাচলের ফলে যে রাস্তার সৃষ্টি হয় তাও কালক্রমে রিল ও গালিতে পরিণত হয়ে ভূমিক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

১১. **ভূমিক্ষয় রোধে অজ্ঞতা :** ভূমিক্ষয় এবং এর কুফল সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ভূমিক্ষয় রোধে জনসাধারণের অনীহার প্রধান কারণ। নদী ভাঙন এবং বৃষ্টিপাতের দরুণ বাংলাদেশের বহু আবাদী জমি ও ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পানি বায়ু দ্বারা কোনো কোনো সময় এত ধীরে ধীরে উর্বর জমির মৃত্তিকা স্থানান্তরিত হয় যে তা কৃষক বুঝতেই পারে না। এরূপ অবস্থা

চলতে থাকলে একদিন হয়তো বাংলাদেশের সোনা ফলানো মৃত্তিকা থেকে আর কোনো ফসলই উৎপাদন করা সম্ভব হবে না।

### ভূমিক্ষয়জনিত ক্ষতি বা ভূমিক্ষয়ের অপকারিতা

পৃথিবীব্যাপী ভূমিয় একটি বিরাট সমস্যা। আবাদী বা অনাবাদী জমিতে এটি ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে চলেছে। নদীর ভাঙনে মৃত্তিকার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে তা আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু আবাদী জমির যে ক্ষয় ধীরে ধীরে গোচরে বা অগোচরে হয়ে চলেছে তা নিয়ন্ত্রণ না করলে একদিন হয়তো বাংলাদেশের অনেক উর্বর ও উৎপাদনশীল জমি অনুর্বর ও অনুৎপাদনশীল জমিতে পরিণত হবে। কি কি উপায়ে ভূমিক্ষয় আমাদের ক্ষতি বা অপকার করে থাকে তা নিচে আলোচনা করা হলো।

**১. ভূমির উর্বর মৃত্তিকার অপসারণ :** ভূমিক্ষয়ের ফলে জমির উপরিস্তরের উর্বর, নরম মৃত্তিকা অপসারিত হয়ে থাকে। কৃষি জমির উপরিস্তরের সাধারণত ১৫–২০ সে.মি. পর্যন্ত মৃত্তিকাতেই উদ্ভিদের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান মজুদ থাকে। এই স্তর থেকেই উদ্ভিদ তার পুষ্টি গ্রহণপূর্বক পরিপুষ্টি লাভ করে। এই মৃত্তিকার অপসারণের ফলে পুষ্টির ঘাটতি হয়, ফলে গাছপালার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ক্রমে ক্রমে ফলন হ্রাস পায়। ফসল মৃত্তিকা থেকে বছরে গড়ে যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে তার চেয়ে প্রায় ১০ গুণ পরিমাণ পুষ্টি ভূমিক্ষয়জনিত কারণে জমি থেকে অপসারিত হয়ে থাকে।

**২. শিকড়ের আকড়ে থাকার শক্তি হ্রাস :** জমির উপরের মৃত্তিকা সরে গেলে গাছের শিকড় ভেসে উঠে এবং মৃত্তিকার সাথে গাছের আঁকড়ে থাকার শক্তি কমে যায়। ফলে অনেক সময় সহজেই গাছপালা হেলে পড়ে বা উপড়ে যায়। শিকড় ভেসে উঠার দরুণ মৃত্তিকা থেকে পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণও হ্রাস পায়।

**৩. নদী–নালা ভরাট হয়ে যাওয়া :** পানি বাহিত মৃত্তিকার অপেক্ষাকৃত ভারী কণা তলদেশে জমা হয়ে ধীরে ধীরে খাল–বিল ও নদী–নালা ভরাট হয়ে যায়। ফলে নৌ–চলাচল, মৎস্য চাষ ও কৃষিকাজে সংকট দেখা দেয়। নদী ভরাট হওয়ার ফলে সহজেই প্লাবনে দেশ ভেসে জানমালের অশেষ ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। এইসব ভরাট নদী–নালা পুন:খননের কাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার শতকরা ২০ ভাগেরও কম খরচে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে ভূমিক্ষয়ের হার কমিয়ে নদী–নালাসমূহকে ভরাট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

**৪. কৃষিজমি বিনষ্ট হওয়া :** ভূমিক্ষয়ের কারণে কৃষি জমি থেকে উর্বর মৃত্তিকার অপসারণ, জমিতে নালা–খন্দের সৃষ্টি, মৃত্তিকা বুনটের অবনতি প্রভৃতির জন্য জমি নষ্ট হয়ে যায়। এরূপ জমির বিক্রয় মূল্য অনেক কমে আসে। নদী ভাঙনের কাছাকাছি জমির মূল্য অনেক সময় প্রায় শূন্যে নেমে আসে। এ ছাড়া নদ–নদী ও সমুদ্রেরকূল ভাঙনে বহু মূল্যবান জায়গা জমি নদীগর্ভে চিরতরে বিলীন হয়ে যায়।

৫. **পরিবেশ দূষণ :** বায়ু ভূমিক্ষয় ধূলিঝড় সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত করে ফেলে। ধূলিঝড়ে বাহিত মৃত্তিকা অনেক সময় গাছপালা, বাড়ি ঘর ঢেকে এসবের অশেষ ক্ষতিসাধন করে থাকে। শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চলে প্রায়ই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

### ভূমিক্ষয় রোধ

আধুনিক কৃষি কর্মকাণ্ডে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হলো ভূমিক্ষয় রোধ। যথাযথ কলা-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানুষের খামখেয়ালীর হাত থেকে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বাংলাদেশের প্রধানতম সম্পদ 'কৃষি' বিরাট হুমকির সম্মুখীন হবে। অপরিকল্পিতভাবে শস্য চাষ, মৃত্তিকার যথাযথ যত্নের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নিবিড় শস্য চাষ করার (intensive cropping) দিকে চাষীদের ঝোঁক, যথেচ্ছভাবে অজৈব সার প্রয়োগ, জৈব সারের অপ্রাপ্যতা ও প্রয়োগে চাষীদের অনীহা প্রভৃতি ইতোমধ্যে মৃত্তিকার অশেষ ক্ষতিসাধন করেছে। তাই আর কালক্ষেপণ না করে অনতিবিলম্বে মৃত্তিকা ক্ষয় নিয়ন্ত্রণকল্পে চাষী এবং সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কলা-কৌশল গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই লক্ষ্যেই এখানে ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপায় আলোচনা করা হলো।

১. **পানির বেগ হ্রাসকরণ :** জমির উপর দিয়ে বৃষ্টির পানি যাতে অবাধে প্রবলবেগে প্রবাহিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। জমিতে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় জায়গায় ছোট-খাট বাঁধ বা আইল তৈরি করে দিলে বেগ কমে আসার দরুণ পানি ধীরে ধীরে অনুস্রবণ প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময় পায়। অসমতল বা ঢালু জমি সমতল করে পানির বেগ হ্রাস করার মাধ্যমে ক্ষয়ীভবনও হ্রাস করা যায়। যেসব জমিতে ছোট বা বড় নালার সৃষ্টি হয়, সেসব জমিতে পানির বেগ হ্রাস করা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ এতে মৃত্তিকাক্ষয় দ্রুত এবং পরিমাণেও বেশি হয়। ছোট ছোট নালা মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট করে সমান করলে পানির বেগ হ্রাস পায় এবং ক্ষয়ও কমে আসে। বড় নালাগুলোও সম্ভব হলে মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট করা প্রয়োজন, তা না হলে এসব নালায় আগাছা জন্মানোর ব্যবস্থা করলে আগাছার বাধা পেয়ে পানি প্রবাহের গতি হ্রাস পায়, ফলে ক্ষয়ীভবনও কমে আসে। নালার শেষ প্রান্তে বা প্রয়োজনে মাঝে মাঝে খুঁটি পুঁতে তাতে তারের জাল দিয়ে এবং এতে জঙ্গল, খড়কুটো ইত্যাদি ফেলে পানির বেগ হ্রাস করা সম্ভব। এর ফলে ধীরে ধীরে পানিবাহিত মৃত্তিকা জমা হয়ে নালা ভরাট হয়ে যায়। এভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত জমি উদ্ধার করে পুনরায় চাষাবাদে আনা সম্ভব হয়। খুব বড় নালা বা নদীর কূল ভাঙন স্থায়ীভাবে পাকা বা কাঁচা বড় বড় বাঁধ তৈরি করে ঠেকানো সম্ভব। নদীর উজানে আড়ি বাঁধ দ্বারা নদীর গতি পরিবর্তন করে এর ভাঙন হ্রাস করা যায়। কাঁচা বাঁধের গায়ে দ্রুত বর্ধনশীল গাছপালা বা চাপড়াজাতীয় ঘাস জন্মিয়ে মৃত্তিকা ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁধ রক্ষা করা সম্ভব।

২. **পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্তকরণ :** কৃষি জমি থেকে দ্রুত পানি সরে যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে সমস্ত মাঠের পানি একত্রে জমে ফুলে, ফেঁপে ওঠে। এর ফলে পানির গতিবেগ বেড়ে গিয়ে প্রবলবেগে প্রবহমান পানি জমির উপরিস্তরের উর্বর মৃত্তিকা অন্যত্র ধুয়ে

নিয়ে যায়। নিষ্কাশন নালার সুব্যবস্থা থাকলে বা প্রয়োজনে পাম্পের সাহায্যে দ্রুত পানি সরিয়ে ফেলে এরূপ পরিস্থিতি থেকে মৃত্তিকাক্ষয় হ্রাস করা যায়। কোনো কোনো সময় অল্প আয়তন করে এক এক খণ্ড জমির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারলে অধিক পানি আর জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে যাবার সুযোগ পায় না ফলে মৃত্তিকাক্ষয় কমে আসে।

৩. **পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ প্রয়োগ :** জৈব পদার্থ মৃত্তিকার প্রাণস্বরূপ। এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো মৃত্তিকার দানাবন্ধনে সহায়তা করা। দানাদার মৃত্তিকার রন্ধ্রপরিসরের ভিতর দিয়ে পানি সহজেই নিচ স্তরে প্রবেশ করতে পারে। তাই একবারে অধিক সময় ধরে প্রবল বগে বর্ষণ না হলে বৃষ্টির পানি এরূপ মৃত্তিকায় না গড়িয়ে শোষিত হয়ে যায়, ফলে ক্ষয়ের হাত থেকে জমি রক্ষা করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া জৈব পদার্থের হিউমাসের আঠালো বৈশিষ্ট্যের জন্য মৃত্তিকা কণা পরস্পর শক্তভাবে এঁটে থাকে। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব পদার্থযুক্ত মৃত্তিকা সহজে পানি বা বায়ু দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বিশেষ করে ভারী, এঁটেলজাতীয় মৃত্তিকায় যদি জৈব পদার্থ কম থাকে তাহলে সে মৃত্তিকার উপর পানি সহজে জমে উঠে এবং পানি প্রবাহের সাথে মৃত্তিকা কণাও সহজে ধুয়ে অন্যত্র চলে যায়। মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ প্রয়োগে অথবা পর্যায়ক্রম শস্য চাষে বিচক্ষণতার সাথে শিমজাতীয় অথবা সবুজ সারজাতীয় শস্য অন্তর্ভুক্ত করে মৃত্তিকার জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবন হ্রাস করা যেতে পারে।

৪. **সিঁড়ি বা ধাপ চাষ পদ্ধতি অবলম্বন** (Terracing) : পাহাড়ী জমির গায়ে ঢাল বরাবর মৃত্তিকা আলগা করে ফসল চাষ করলে বৃষ্টির পানিতে উপরিস্তরের উর্বর এই আলগা মৃত্তিকা সহজেই ধুয়ে নিচে ঝরণায় গিয়ে পড়ে। এভাবে পাহাড়ের উর্বর মৃত্তিকা এক বছরের মধ্যেই অনুর্বর হয়ে চাষের অনুপযোগী হয়ে যায়। আমাদের দেশের দক্ষিণ–পূর্ব দিকে অবস্থিত বিভিন্ন পাহাড়ী জেলার অধিবাসীরা পাহাড়ের গায়ে ঢাল বরাবর ঝুম পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করে জমিকে ক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এভাবে চাষ না করে পাহাড়ের গায়ে ঢাল আড়াআড়ি সিঁড়ি বা ধাপ পদ্ধতিতে ফসল চাষ করা উচিত। এ পদ্ধতিতে ফসল চাষাবাদ করলে বৃষ্টির পানিতে সহজে ধুয়ে যেতে পারে না। এভাবে ধাপ সৃষ্টি করায় পানি প্রবাহ ধাপে বাধা পেয়ে মন্থর হয়ে পড়ে, পানি মৃত্তিকা অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময় পায় এবং ফলে ক্ষয় কম হয়। এই পদ্ধতিতে সব রকম শস্য যেমন আনারস, কলা, পেয়ারা, তুলা, শাক–সবজি প্রভৃতি চাষ করে আশানুরূপ ফলনের সাথে সাথে মৃত্তিকা ক্ষয়রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

৫. **কন্টুর বা সমুন্নত রেখায় চাষ পদ্ধতি অবলম্বন** (Contouring) : এটিও পাহাড়ের ঢালে ফসল চাষ করার অন্য একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পাহাড়ের চারদিকের গায়ে ঢাল আড়াআড়ি একই কন্টুর লাইন বা সমুন্নত রেখায় জমি চাষ করে ফসল ফলানো হয়ে থাকে। পদ্ধতিগত কিছুটা জটিলতার কারণে এবং দেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পাহাড়ী অঞ্চলে বর্তমানে এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা সম্ভব নয়। উন্নত দেশসমূহে পাহাড়ী অঞ্চলে এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ একটি প্রচলিত প্রথা। এভাবে জমি চাষ করার ফলে উপর থেকে প্রবাহিত পানি ঢাল আড়াআড়ি জন্মানো ফসল দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত

হওয়ার ফলে গতি কমে আসে এবং ফলে মৃত্তিকা অপসারণও কম হয়। দীর্ঘস্থায়ী ফসল যেমন লেবু, পেয়ারা, কাঠ উৎপাদনকারী বৃক্ষ, কমলা, কাঁঠাল, বাতাবিলেবু প্রভৃতি এই পদ্ধতিতে উৎপাদন করা শ্রেয়। কিছুটা কম খাড়া জমি এরূপ পদ্ধতির জন্য উত্তম।

৬. **খণ্ড খণ্ড প্লটে শস্য চাষ পদ্ধতি অবলম্বন** (Stripping) : পাহাড়ী বা অসমতল জমির সমস্ত ঢালে একইভাবে একটি ফসল না ফলিয়ে জমি সুবিধামত খণ্ড খণ্ড করে ঢাল আড়াআড়ি বিভিন্ন ফসল জন্মানোর পদ্ধতিকে খণ্ড খণ্ড প্লটে শস্য চাষ পদ্ধতি (strip cropping) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে একখণ্ড জমিতে ধান চাষ করলে অপর খণ্ডে হয়তো তিল, চীনাবাদাম এবং আর অন্য খণ্ডে হয়তো ধান লাগানো যেতে পারে। এভাবে ফসল আবাদ করলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রবাহিত পানি বিভিন্ন ফসলের গোড়ায় বাধা পায় এবং গতি কমে আসে। এর ফলে পানির সাথে নিচের দিকে ধাবমান মৃত্তিকা কণা কিছু কিছু করে এ সমস্ত ফসলের গোড়ায় আটকে যায়, ফলে মৃত্তিকার ক্ষয় হ্রাস পায়। পরীক্ষা–নিরীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব জমিতে সাধারণভাবে চাষ করে ফসল ফলানো হয়, সেসব জমি থেকে বছরে হেক্টর প্রতি ২৫৬ টন মৃত্তিকা অপসারিত হয়ে থাকে, অন্যদিকে স্ট্রিপ ক্রপিং অনুসরণ করলে মাত্র ৬.৫০ টন মৃত্তিকা অপসারিত হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালুতে বা অসমতল জমিতে শস্য চাষের জন্য উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করলে ক্ষয়রোধের সাথে সাথে মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণ পানি শোষিত হয়ে থাকে।

৭. **বায়ু গতিরোধক গাছ লাগানো :** যেসব অঞ্চলে বায়ুজনিত ভূমিক্ষয় প্রকট, সেসব অঞ্চলে বায়ু প্রবাহের দিকে সারিতে লম্বা ও ঝোপজাতীয় গাছপালা ঘন ঘন করে লাগানো আবশ্যক। এসব গাছপালা বায়ু প্রবাহের বেগ কমিয়ে দেয় ফলে মৃত্তিকার অপসারণ কম হয়। গাছপালা জন্মানোর মাধ্যমে যতোটা সম্ভব বেশি সময় জমি আবৃত রেখে পানি এবং বায়ুজনিত ক্ষয় কমিয়ে আনা যায়।

৮. **ভূমিকর্ষণে সাবধানতা অবলম্বন :** জমিতে সামান্যতম ঢাল থাকলেও সে জমিতে ঢাল আড়াআড়ি কর্ষণ করা প্রয়োজন। কর্ষণের পর মৃত্তিকা আলগা হওয়ার দরুণ পানি ঢালুর দিকে সহজে গড়িয়ে যেতে পারে না, ফলে পানি মৃত্তিকা অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের বেশি সময় পায়। বছরের যে সময় বায়ু বা পানি দ্বারা মৃত্তিকা অপসারণের সম্ভাবনা বেশি, সে সময় জমি উন্মুক্ত না রাখাই শ্রেয়। শুষ্ক অঞ্চলে বালিজাতীয় জমিতে শস্য জমিয়ে বা আবর্জনা দ্বারা জমি আবৃত রেখে অথবা পূর্ববর্তী শস্যের গোড়া জমিতে রেখে বায়ুঘটিত ক্ষয় থেকে মৃত্তিকা রক্ষা করা যায়। এসব অঞ্চলে মৃত্তিকা সিক্ত রেখেও বায়ু দ্বারা মৃত্তিকা কণা উড়িয়ে নেবার সম্ভাবনা কমিয়ে আনা যায়। যে সব অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয়ের সম্ভাবনা খুব বেশি সে সব অঞ্চলে যতোটা সম্ভব কম মৃত্তিকা কর্ষণ করে বা শূন্যকর্ষণে শস্য জন্মানো যেতে পারে। সাভানা অঞ্চলে শুধুমাত্র হো'র (hoe) সাহায্যে গর্ত করে ভুট্টা বুনে দেয়া হয়। গর্তের আশেপাশে মৃত্তিকা নাড়াচাড়া করা হয় না। মৃত্তিকা ক্ষয়রোধের জন্যই এরূপ পদ্ধতিতে শস্য চাষ করা হয়।

**৯. যথাযথ শস্যবিন্যাস অনুসরণ :** যে সব জমিতে মৃত্তিকা ক্ষয়ের সম্ভাবনা বেশি সেসব জমিতে উপযুক্ত শস্য পর্যায় বা শস্যবিন্যাস অনুসরণ করে মৃত্তিকা ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চাপড়া, শিম বা সবুজ-সারজাতীয় শস্য মৃত্তিকা আবৃত করে রাখে বলে মৃত্তিকা ক্ষয়রোধে এসব শস্য খুবই কার্যকরী। অন্যদিকে সারিতে বপনকৃত ভুট্টা, আখ, তুলা প্রভৃতি শস্যের চাষাবাদ পদ্ধতি মৃত্তিকা ক্ষয়ের জন্য অনুকূল। তাই বিবেচনার সাথে শস্যবিন্যাস অনুসরণ করলে মৃত্তিকা ক্ষয় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

**১০. নিয়ন্ত্রিত গো-চারণ :** অনেক সময় যথেচ্ছভাবে গরু-মহিষ চরিয়ে জমি উন্মুক্ত করে ফেলা হয়। জমিতে গরু-মহিষের চলাচলে এবং পানি বা বায়ুজনিত কারণে উন্মুক্ত মৃত্তিকা বেশি ক্ষয় হয়। মৃত্তিকা ক্ষয় নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য গরু-মহিষের চলাচল ও চরানো নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

**১১. অপরিকল্পিত গাছপালা ধ্বংস বন্ধকরণ :** অপরিকল্পিতভাবে গাছপালা, বনরাজি ইত্যাদি ধ্বংস বন্ধ করতে হবে। বাঁধের ধারে, পাহাড়ের ঢালে পরিকল্পিতভাবে গাছপালা জন্মিয়ে মৃত্তিকা ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

**১২. মৃত্তিকা ক্ষয়ের অপকার সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতনকরণ :** মৃত্তিকা ক্ষয় বা ভাঙন যে কতটা ভয়াবহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া উর্বর জমি থেকে ধীরে ধীরে মৃত্তিকা ক্ষয় হয়ে জমির উৎপাদন হ্রাস পায়। এসব ব্যাপারে জনসাধারণকে সচেতন করা প্রয়োজন। নদী বা সমুদ্রের বড় বড় ভাঙন সরকারি পর্যায়ে রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

দশম অধ্যায়

# বাংলাদেশের সমস্যাপূর্ণ মৃত্তিকা ও তার সম্ভাব্য সমাধান

(Problem Soil of Bangladesh & Their Possible Solutions)

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমতল এবং নদীবিধৌত পলি দিয়ে গঠিত বলে ফসল উৎপাদনে মৃত্তিকা তেমন কোনো জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে না। তবে কিছু কিছু এলাকা, যেমন— সমুদ্রোপকূল জেলাসমূহ, পার্বত্য এলাকা এবং চরাঞ্চলসমূহ আশানুরূপ ফসল উৎপাদনে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। এসব এলাকার মধ্যে দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কূল বরাবর অবস্থিত বিভিন্ন জেলার লবণাক্ত ক্ষারীয় মৃত্তিকা সবচেয়ে সমস্যাপূর্ণ এবং ফসল উৎপাদনের জন্য এদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাও বেশ জটিল। তাই প্রথমেই এই এলাকার মৃত্তিকা ও ফসল উৎপাদনে এদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

## সমুদ্রোপকূলের লবণাক্ত মৃত্তিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৩টি জেলার ৬৪টি থানার প্রায় ২৮·০০ লক্ষ হেক্টর জমি সমুদ্রোপকূলের অন্তর্ভুক্ত। এই জেলাগুলো হলো— সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালি, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালি, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার (মানচিত্র ১ দ্রষ্টব্য)। উক্ত ২৮·০০ লক্ষ হেক্টরের মধ্যে ৮·৩৩ লক্ষ হেক্টর আবাদযোগ্য যা উল্লেখিত ১৩টি জেলার মোট আবাদী জমির প্রায় ৫২·৮০ ভাগ। এই ২৮.০০ লক্ষ হেক্টর জমি বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে কম-বেশি লবণাক্ততার শিকার। এসব জমির শস্য নিবিড়তা দেশের গড় নিবিড়তার (১৫৯%) চেয়ে খুবই কম এবং এলাকাভেদে পার্থক্যতাও বেশি। পটুয়াখালি, বাগেরহাট এলাকায় শস্য নিবিড়তা যেখানে প্রায় ১১৪% সেখানে কক্সবাজারের দিকে মাত্র ৬২%।

কৃষি পরিবেশিক অঞ্চল হিসেবে এই ১৩টি জেলাকে ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে নিচের তিনটি প্রধান উপকূলীয় অঞ্চল অন্তভুক্ত (মানচিত্র ২ দ্রষ্টব্য)।

১. গাঙ্গেয় জোয়ার প্লাবন ভূমি (১৭·১০ লক্ষ হেক্টর)
২. নতুন মেঘনা মোহনা প্লাবন ভূমি (৯·৩০ লক্ষ হেক্টর)
৩. চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি (১·৪০ লক্ষ হেক্টর)

তাছাড়া লবণাক্ত এলাকায় ৬০৪ হেক্টর জুড়ে সেন্ট মার্টিন দ্বীপও রয়েছে।

## লবণাক্ততার শ্রেণীবিভাগ

উপকূলীয় মোট প্রায় ২৮·০০ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে প্রায় ৮·৩৩ লক্ষ হেক্টর জমি সুষ্ঠু মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষাবাদে এনে আশানুরূপ ফলন লাভ করা সম্ভব। বাংলাদেশে

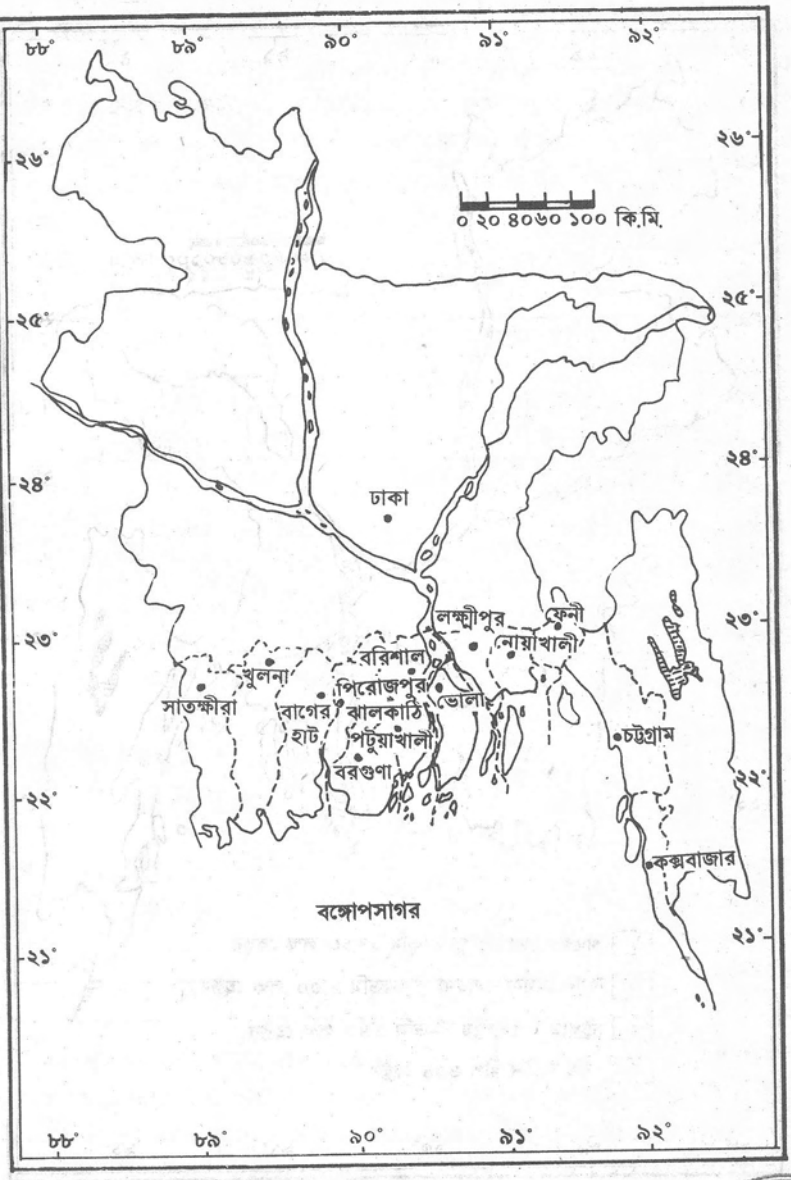


চিত্র ১২ : বাংলাদেশের লবণাক্ত মৃত্তিকাঞ্চল নির্দেশিত জেলা।

BANDOG Library Dhaka

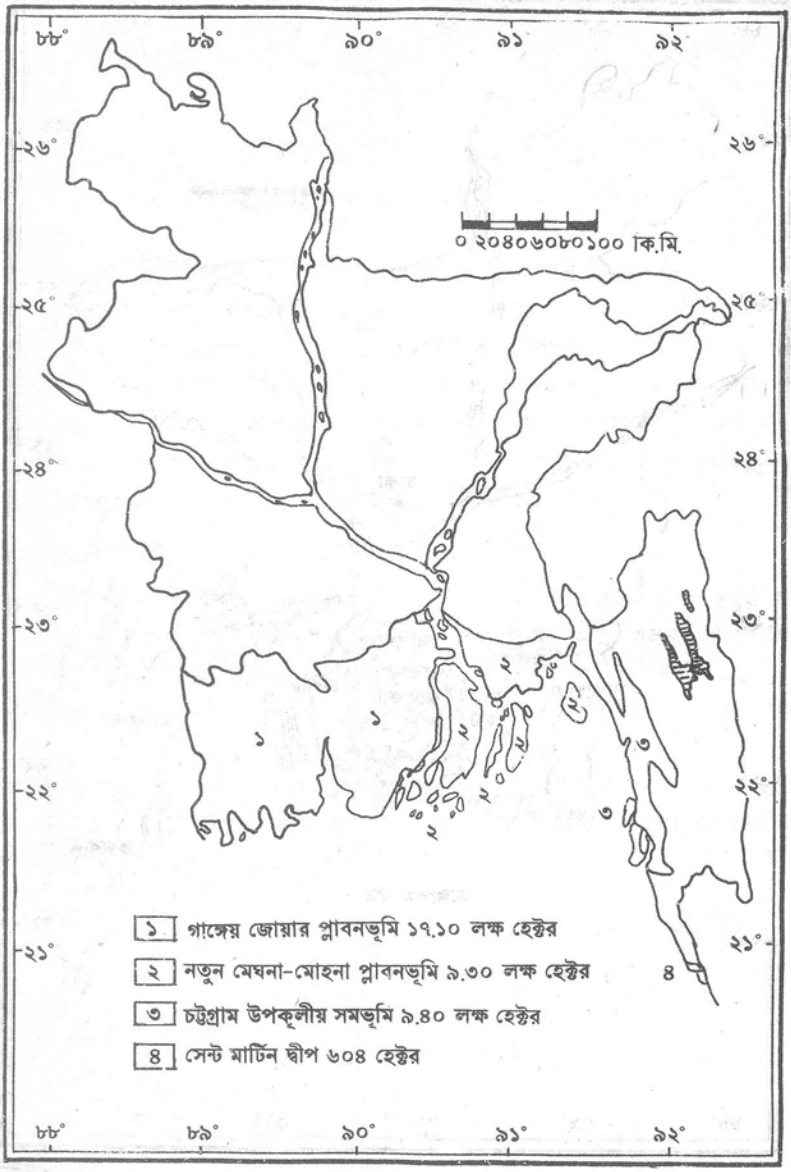


চিত্র ১৩ : বাংলাদেশের উপকূলীয় কৃষি পরিবেশিক অঞ্চল।

অতীতে জনসংখ্যা কম এবং খাদ্যের উপর ততটা চাপ না থাকায় এসব জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ এবং খাদ্য ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে এসব জমি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষের আওতায় এনে ফসল উৎপাদনের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে। সারণি ১১–এ ১৩টি জেলার এই ৮·৩৩ লক্ষ হেক্টর জমির লবণাক্ততার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করা হলো।

**সারণি ১১ : উপকূলীয় জমির লবণাক্ততার শ্রেণীবিভাগ**

| জেলার নাম | লবণাক্ততার শ্রেণীবিভাগ (জমি হেক্টরে) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | খুব অল্প লবণাক্ততা | অল্প লবণাক্ততা | মধ্যম লবণাক্ততা | খুব বে শি লবণাক্ততা | মোট লবণাক্ত জমি |
| সাতক্ষীরা | ১৬,৫০০ | ৮৫,৬০০ | ৩৩,৩৫০ | ১০,৯০০ | ১,৪৬,৩৫০ |
| খুলনা | ৩,৯০০ | ৯২,৫৪০ | ১৩,৮০০ | ৯,৮০০ | ১,২০,০৪০ |
| বাগেরহাট | ২৮,৩০০ | ৭৭,০৮০ | ২,৬০০ | --- | ১,০৭,৯৮০ |
| পিরোজপুর | ১৮,৪০০ | ১,৯০০ | --- | -- | ২০,৩০০ |
| বরগুনা | ৯৬,৩৯০ | ৭,২০০ | --- | --- | ১,০৩,৫৯০ |
| পটুয়াখালি | ৬৮,৫০০ | ৪৬,৬০০ | --- | --- | ১,১৫,১০০ |
| ভোলা | ৯,৫২০ | ৩০,৮১০ | --- | --- | ৪০,৩৩০ |
| লক্ষ্মীপুর | ১০,৯০০ | ৬,৮০০ | ১,৬০০ | --- | ১৯,৩০০ |
| নোয়াখালি | ৬,৩০০ | ৩৯,৯০০ | ৩,৪০০ | --- | ৪৯,৬০০ |
| ফেনী | ১,৬০০ | ৬,৬০০ | ৭০০ | --- | ৯,০০০ |
| চাঁদপুর | ১৫,০০০ | --- | --- | --- | ১৫,০০০ |
| চট্টগ্রাম | ১৮,৪০০ | ১৫,১০০ | ৭,০০০ | ৫,২০০ | ৪৫,৭০০ |
| কক্সবাজার | ৭,২০০ | ১৬,২০০ | ১৭,৩০০ | ১৪,০০০ | ৫৪,৭০০ |
| মোট | ২,৮৭,৪১০ | ৪,২৬,৪০০ | ৭৯,৭৫০ | ৩৯,৯০০ | ৮,৩৩,৪৯০ |

**ভূ–সংস্থানভিত্তিক জমির শ্রেণীবিভাগ :** ভূ–সংস্থার নিরীক্ষণে উপকূলীয় এলাকার জমিসমূহ চারটি ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে মধ্যম উঁচু শ্রেণীর জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, প্রায় ১১·৫৬ লক্ষ হেক্টর, পক্ষান্তরে মাত্র ৫,৭০৪ হেক্টর নিচু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সারণি ১২–এ জেলাওয়ারী ভূ–সংস্থানভিত্তিক জমির পরিমাণ উপস্থাপন করা হলো। এই জমি প্রধানত গাঙ্গেয়, মাতামুহুরী এবং মেঘনা নদীর জোয়ার ও মোহনা প্লাবন ভূমির অর্ন্তগত।

প্রতিদিন জোয়ার–ভাটার প্রভাবে এসব এলাকা সামুদ্রিক পানিতে প্লাবিত হয়। কোনো কোনো এলাকার উপকূল বরাবর উঁচু বাঁধ দিয়ে লোনা পানির প্রবেশ বন্ধ করে ধান চাষ করা

সারণি ১২ : ভূ-সংস্থানভিত্তিক শ্রেণীর জমির পরিমাণ

| জেলার নাম | ভূ-সংস্থানভিত্তিক জমির শ্রেণীবিভাগ (হেক্টরে) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | উঁচু জমি | মধ্যম উঁচু জমি | মধ্যম নিচু জমি | নিচু জমি | মোট জমি |
| সাতক্ষীরা | ৩৫,৩২২ | ১,৪০,২০৯ | ৬,৬৭৮ | ০ | ১,৮২,২০৯ |
| খুলনা | ৯,৬২২ | ১,২৪,৪৬৬ | ১১,৪০২ | ৩,৩৬১ | ১,৪৮,৮৯১ |
| বাগেরহাট | ১৩,০৩৪ | ১,২৫,৭৬৯ | ৬,১৭৮ | ৮২৪ | ১,৪৫,৮০৫ |
| পিরোজপুর | ৬৭৮ | ৩৪,১৭৪ | ১৩৪ | --- | ৩৪,৯৮৬ |
| বরগুনা | ৩১৭ | ১,১৮,৮৫১ | ৩১২ | --- | ১,১৯,৪৮০ |
| পটুয়াখালি | ২,১৮৮ | ১,৫০,৩৭৪ | ১২,৯৯৭ | --- | ১,৬৫,৫৫৯ |
| ভোলা | --- | ৯৮,৫৭৪ | ১৯,৮৩২ | --- | ১,১৮,৪০৬ |
| লক্ষ্মীপুর | ৫,২২০ | ৬৪,১৩৫ | ১৩,৪০৩ | --- | ৮২,৭৫৮ |
| নোয়াখালি | ১,২২২ | ১,২৬,৯৫৮ | ৪০,৯১৯ | ৫২৪ | ১,৬৯,৬২৩ |
| ফেনী | ৪,৬৬৭ | ৪১,০৫৩ | ৭,৫৫৮ | ৯৯৪ | ৫৪,২৭২ |
| চাঁদপুর | ৯১৭ | ২,৪৯৩ | ৪,৪১৯ | ১ | ৭,৮৩০ |
| চট্টগ্রাম | ৬১,৩৫৮ | ৮২,২৫০ | ১২,১৯৯ | --- | ১,৫৫,৮০৭ |
| কক্সবাজার | ১,১৮,৫২৭ | ৪৭,১৩০ | ২৪,৬৭৯ | --- | ১,৯০,৩৩৬ |
| মোট = | ২,৫৩,১১২ | ১১,৫৬,৪৩৬ | ১,৬০,৭১০ | ৫,৭০৪ | ১৫,৭৫,৯৬২ |

হচ্ছে। খরিপ মৌসুমে একমাত্র ফসল রোপা আমন ধানের চাষ ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কিছু এলাকায় চিংড়ি চাষ প্রসার লাভ করছে। আর খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে সমুদ্রের কূল বরাবর সৃষ্টি হয়েছে সুন্দর বনের বিস্তীর্ণ অরণ্যরাজি।

### লবণাক্ততার কারণ

উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে অধিকাংশ জমিতেই কম-বেশি লবণাক্ততা দেখা যায়। এই লবণাক্ততার জন্য ছোট এই দেশের বিরাট এক অংশে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। নিম্নলিখিত কারণসমূহ এই লবণাক্ততার জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়।

১. সমুদ্র সংলগ্ন নদী এবং খাঁড়ির মাধ্যমে পার্শ্বগতিতে লবণাক্ত পানির প্রবেশের ফলে জমি লবণাক্ত হয়ে যায়।

২. শুষ্ক মৌসুমে অত্যধিক লবণহেতু মৃত্তিকা অন্তস্থ লবণাক্ত পানি বাষ্পীভবনে উপরে উঠে এসে জমি লবণাক্ত করে তোলে।

৩. জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হয়ে জমি লবণাক্ত হয়ে যায়।

৪. কোনো কোনো সময় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনের কারণে জমিতে লবণের অনুপ্রবেশ ঘটে।

৫. চিংড়ি চাষের নিমিত্তে চিংড়ি ঘেরের মধ্যে সামুদ্রিক পানি প্রবেশ করানোর ফলে জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ে।

৬. উজানে পশ্চিম দিকে ফারাক্কা বাঁধ দ্বারা পানির পূর্বদিকে অবাধ প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সমুদ্রের পানি স্থলভাগে উঠে অধিক জমি লবণাক্ত করে তুলছে।

শুষ্ক মৌসুমে অত্যধিক বাষ্পীভবনের কারণে মৃত্তিকা শুকিয়ে গেলে লবণাক্ততা প্রকট হয়ে ওঠে। এ সময় মৃত্তিকা রস শুকিয়ে যাওয়ার দরুণ নিচ থেকে লবণ এসে জমির উপরে জমা হয়, ফলে শুষ্ক রবি মৌসুমে ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় না। খরিপ মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টি হলে জমির লবণের ঘনত্ব হ্রাস পায়, লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে শিকড় অঞ্চলের বাইরে চলে যায়। এজন্য এ সময় একমাত্র স্থানীয় জাতের রোপণ আমন ধান চাষ করা সম্ভব হয়। তবে হেক্টর প্রতি ফলন কম হয়ে থাকে।

## উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি পরিবেশ

বৃষ্টিপাত, বাষ্পীভবন, প্রস্বেদন অনুপাত, তাপমাত্রা, মৃত্তিকা রস প্রভৃতি সব অঞ্চলে, সব সময়ই শস্য উৎপাদন এবং শস্য বিন্যাসের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে পানিতে লবণের উপস্থিতি, সীমিত শস্য-চাষ সময়কাল প্রভৃতি স্বাভাবিক শস্য উৎপাদন কার্যক্রম অধিকতর সমস্যাপূর্ণ ও জটিল করে তোলে। প্রতিনিয়ত লোনা পানির জোয়ার-ভাটা, আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বন্য এবং জলোচ্ছ্বাস শস্য উৎপাদন সময়কাল সীমিত করে ফেলে। তাই এসব অঞ্চলে সুষ্ঠু শস্য উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এতদাঞ্চলের খরিপ ও রবি মৌসুম সময়কাল, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

**বৃষ্টিপাত :** দেখা গেছে যে, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলায় খরিপ মৌসুমে খুলনা, নোয়াখালি এবং ফেনী জেলার চেয়ে বছরে বৃষ্টিপাতকাল প্রায় ২০ দিন বেশি অর্থাৎ অসেচকৃত শস্য চাষের ক্ষেত্রে উক্ত দুটি জেলায় ২০টি দিন বেশি পাওয়া যায়। এ অবস্থায় খুলনা এবং সাতক্ষীরায় অসেচকৃত ফসল উৎপাদন ঝুকিপূর্ণ। পটুয়াখালি এবং ভোলা জেলায় তুলনামূলকভাবে বৃষ্টিপাত কিছুটা বশি। এই দু'জেলার মধ্যে আবার ভোলা জেলায় শস্য উৎপাদন সময়কাল বেশি হওয়ার কারণে এখানে খরিপ মৌসুমে অসেচকৃত শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা অধিক।

**তাপমাত্রা :** উপকূলীয় অঞ্চলে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৮.৬০-২০.২০° সেলসিয়াস সাধারণত জানুয়ারি মাসের প্রথম দু'সপ্তাহের দিকে পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ২৮.৭০-৩০.১০° সেলসিয়াস মে মাসের শেষ পক্ষে বিরাজ করে। কিন্তু ভোলা জেলায় এই তাপমাত্রা জুন মাসের প্রথম পক্ষে লক্ষ্য করা যায়।

**শস্য সময়কাল :** উপকূলীয় অঞ্চলে পাঁচটি স্বতন্ত্র খরিপ শস্য চাষ সময়কাল বিদ্যমান। এটি সাধারণত মে মাস থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। খরিপ সময়কাল সাধারণত ১৯০–২৪০ দিন পর্যন্ত বিস্তৃত। ফেনী, ভোলা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতে সময়কাল বেশি এবং সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনাতে কম (সারণি ১৩ দ্রষ্টব্য)। মার্চের মাঝামাঝি থেকে মে–র মাঝামাঝি সময়কালকে খরিপ পূর্ববর্তী সময়কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

রবি শস্য চাষ সময়কাল সাধারণত অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিস্তৃত। তুলনামূলকভাবে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ভোলাতে বেশি, ১২০–১৪৫ দিন। পক্ষান্তরে বাগেরহাট, খুলনা, চাঁদপুর এবং পিরোজপুর কম, ১১৫–১৪০ দিন (সারণি ১৩)।

## উপকূলীয় অঞ্চলের মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য

**বুনট :** উপকূলীয় অঞ্চলের মৃত্তিকা প্রধানত পলি দোআঁশ থেকে পলি এঁটেল শ্রেণীর অন্তর্গত। তবে কিছু কিছু এঁটেল দোআঁশ এবং বেলেজাতীয় মৃত্তিকা পটুয়াখালি জেলার কলাপাড়া থানা এবং কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া, মহেশখালি এবং টেকনাফ থানায় দেখতে পাওয়া যায়। পলি এঁটেল থেকে এঁটেল শ্রেণীর মৃত্তিকা বরগুনা জেলার আমতলী, পাথরঘাটা এবং বরগুনা সদর থানায় এবং সাতক্ষীরা জেলার তালা, আশাশুনি ও সাতক্ষীরা সদর থানায় বেশি দেখা যায়।

**$pH$ :** উপকূলীয় লবণাক্ত মৃত্তিকার $pH$ মান সাধারণত ৬·০–৮·৪ অর্থাৎ মৃদু অম্ল থেকে বেশ ক্ষারকীয়। তবে চট্টগ্রাম এবং পটুয়াখালি কিছুটা ব্যতিক্রম, এখানে $pH$ মান ৫·০–৭·৮। অধিকাংশ মৃত্তিকা মৃদু ক্ষারীয় থেকে তীব্র ক্ষারীয় শ্রেণীর। উপরিমৃত্তিকার চেয়ে আন্তঃমৃত্তিকায় $pH$ মান অধিক। উঁচু $pH$ মান উপকূলীয় মৃত্তিকায় অপ্রধান পুষ্টির অভাবজনিত সমস্যা সৃষ্টি করে।

**জৈব পদার্থ :** উপকূলীয় মৃত্তিকায় সাধারণত জৈব পদার্থের পরিমাণ খুবই কম। এই পরিমাণ এলাকাভেদে ১–১·৫, যেখানে ৫ ভাগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার কোনো কোনো স্থানে উপরিমৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ ৭·০ ভাগ। সাধারণভাবে অল্প পরিমাণ জৈব পদার্থের উপরিস্থিতির কারণে উপকূলীয় মৃত্তিকার ভৌত ধর্ম ভাল নয়।

**ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা :** উপকূলীয় মৃত্তিকায় ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা সাধারণত প্রতি ১০০ গ্রাম মৃত্তিকায় ৯·৪–৪·০৬ মিলি ইকুভ্যালেন্ট (9·4-4·06 mg/100 gm of soil)। বরগুনা, সাতক্ষীরা, ভোলা, ফেনী, লক্ষ্মীপুর জেলার অধিকাংশ মৃত্তিকার এই ক্ষমতা ১০–২০ মিলি ইকুভ্যালেন্ট, পক্ষান্তরে খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় ২০–৪০ মিলি ইকুভ্যালেন্ট। খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় এরূপ অধিক ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা সম্ভবত মৃত্তিকার কিছুটা বেশি জৈব পদার্থ ও উন্নত ভৌত ধর্মের কারণে ঘটে থাকবে।

সারণি ১৩ : উপকূলীয় জেলার খরিপ ও রবি শস্য চাষের গড় সময়কাল

| জেলার নাম | কৃষি পরিবেশিক অঞ্চল | খরিপ সময়কাল | | | রবি সময়কাল | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | শুরু | শেষ | গড় সময়কাল (দিন) | শুরু | শেষ | গড় সময়কাল (দিন) |
| সাতক্ষীরা | গাঙ্গেয় জোয়ার প্লাবন ভূমি | ২১ মে | ১৪ ডিসে: | ১৯০–২১০ | ২১ অক্টো: | ২ মার্চ | ১১৫–১৪৫ |
| খুলনা | গাঙ্গেয় জোয়ার প্লাবন ভূমি | ১৬ মে | ১০ ডিসে: | ২০০–২২০ | ১৫ অক্টো: | ১৭ ফেব্রু: | ১১৫–১৩৫ |
| বাগেরহাট | গাঙ্গেয় জোয়ার প্লাবন ভূমি | ১৬ মে | ১০ ডিসে: | ২০০–২২০ | ১৫ অক্টো: | ২২ ফেব্রু | ১১৫–১৪০ |
| পিরোজপুর | গাঙ্গেয় জোয়ার প্লাবন ভূমি | ৯ মে | ১০ ডিসে: | ২১০–২২০ | ১৫ অক্টো: | ২২ ফেব্রু: | ১২০–১৪০ |
| বরগুনা | গাঙ্গেয় জোয়ার প্লাবন ভূমি | ৯ মে | ১০ ডিসে: | ২১০–২২০ | ১৫ অক্টো: | ২২ ফেব্রু: | ১২০–১৪০ |
| পটুয়াখালি | গাঙ্গেয় জোয়ার প্লাবন ভূমি<br>নুতন মেঘনা মোহনা প্লাবন ভূমি | ৩ মে | ১৪ ডিসে: | ২১০–২২০ | ২১ অক্টো: | ২ মার্চ | ১২০–১৪৫ |
| ভোলা | নুতন মেঘনা মোহনা প্লাবন ভূমি | ২৭ এপ্রিল | ১৮ ডিসে: | ২২০–২৪০ | ২১ অক্টো: | ৫ মার্চ | ১২০–১৪৫ |
| লক্ষ্মীপুর | নুতন মেঘনা মোহনা প্লাবন ভূমি<br>পুরাতন মেঘনা মোহনা প্লাবন ভূমি | ৩ মে | ১৮ ডিসে: | ২২০–২৪০ | ২১ অক্টো: | ৫ মার্চ | ১২০–১৪৫ |
| নোয়াখালি | নুতন মেঘনা মোহনা প্লাবন ভূমি<br>পুরাতন মেঘনা মোহনা প্লাবন ভূমি | ২৭ এপ্রিল | ১৮ ডিসে: | ২২০–২৪০ | ২৪ অক্টো: | ২ মার্চ | ১২০–১৪৫ |
| ফেনী | নুতন মেঘনা মোহনা প্লাবন ভূমি<br>পুরাতন মেঘনা মোহনা প্লাবন ভূমি | ২৭ এপ্রিল | ১৮ ডিসে: | ২৩০–২৪০ | ২৪ অক্টো: | ৫ মার্চ | ১২০–১৪৫ |
| চাঁদপুর | নুতন মেঘলা মোহনা প্লাবন ভূমি | ৯ মে | ১০ ডিসে: | ২১০–২২০ | ১৫ অক্টো: | ২২ ফেব্রু: | ১২০–১৪০ |
| চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি<br>নুতন মেঘনা মোহনা প্লাবন ভূমি | ২৭ এপ্রিল | ১৮ ডিসে: | ২২০–২৪০ | ২১ অক্টো: | ৫ মার্চ | ১২০–১৪৫ |
| কক্সবাজার | চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি, উত্তর–দক্ষিণ পাহাড়ী ভূমি, সেন্টমার্টিন কোরাল দ্বীপ | ৩ মে | ১৪ ডিসে: | ২২০–২৩০ | ২১ অক্টো: | ২ মার্চ | ১২০–১৪৫ |

উপকূলীয় মৃত্তিকায় সাধারণত বিনিময়ী সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের চেয়ে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু অনেক জেলাতেই কোনো কোনো স্থানের মৃত্তিকায় বিনিময়ী সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নের পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম আয়নের পরিমাণের চেয়ে বেশি যা মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের ক্ষতি সাধনপূর্বক গাছের জন্য পুষ্টি উপাদান অলভ্য করে তোলে। ম্যাগনেসিয়াম গাছের ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

**পুষ্টি উপাদান :** উপকূলীয় মৃত্তিকায় সাধারণত মোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুবই কম, মোটামুটি ০·১ ভাগ। খুব অল্প পরিমাণ জৈব পদার্থের উপস্থিতি এর কারণ। অধিকাংশ মৃত্তিকায় লভ্য ফসফরাস ১৫–২৫ পিপিএম। চট্টগ্রাম, বরগুনা, সাতক্ষীরা এবং পটুয়াখালি জেলায় কিছু কিছু মৃত্তিকায় ফসফরাসের অভাব দেখা যায়।

অপ্রধান পুষ্টির মধ্যে সাধারণভাবে জিঙ্ক ও তামার অভাব সমস্ত উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান। কিন্তু চট্টগ্রাম, পটুয়াখালি এবং বরগুনা জেলায় অন্যান্য জেলার চেয়ে দস্তা ও তামার অভাবের তীব্রতা কম। সমুদ্রের পানিতে বোরনের আধিক্য থাকলেও মৃত্তিকায় কিন্তু বোরনের আধিক্য দেখা যায় না।

## প্রচলিত জমি ব্যবহাররূপ

উপকূলীয় অঞ্চলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কম বেশি প্রায় সব রকম শস্যই, যেমন— ধান, পাট, আখ, ডাল, তেল, মশলা, শাক–সবজি এবং ফল–মূল চাষ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে জেলা ও ফসলভেদে চাষের নিবিড়তায় প্রচুর পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় যা সাধারণত অন্যান্য অঞ্চলের নিবিড়তার মধ্যে ততোটা দেখা যায় না। উঁচু জমিতে স্থানীয় জাতের আমন ধানের চাষে শস্য নিবিড়তা সবচেয়ে বেশি। পক্ষান্তরে মধ্যম নিচু জমিতে পাট ফসলের ক্ষেত্রে শস্য নিবিরতা সবচেয়ে কম (সারণি ১৪ দ্রষ্টব্য)।

বরিশাল, খুলনা এবং পটুয়াখালি অঞ্চলের উঁচু শ্রেণীর জমিতে স্থানীয় জাতের রোপা আমন চাষই প্রধান, পক্ষান্তরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ শ্রেণীর জমিতে প্রধানত উফশী আমনের চাষ হয়ে থাকে। বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালি, পটুয়াখালি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্যম উঁচু জমির প্রধান ফসল হচ্ছে স্থানীয় জাতের রোপা আমন। বরিশাল, খুলনা এবং নোয়াখালির মধ্যম নিচু জমিতে প্রধানত ছিটানো আমন ধানের চাষ করা হয়। অপরদিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ শ্রেণীর জমির প্রধান ফসল বোনা আউশ ধান।

বর্ষা বা খরিপ মৌসুমে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রধানত স্থানীয় জাতের রোপা আমন ধানের চাষ করা হয়ে থাকে, যার ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ২·৫ থেকে ৩·০ টন। খুলনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালি অঞ্চলের প্রধান শস্যবিন্যাস হচ্ছে খরিপ মৌসুমে স্থানীয় জাতের রোপা আমন এবং রবি মৌসুমে পতিত। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ২৫ থেকে ২৮ ভাগ জমিতে বোনা আউশ বনাম স্থানীয় জাতের রোপা আমন শস্যবিন্যাসের প্রচলন দেখা যায়। এর পরেই ১৮

সারণি ১৪ : ভূসংস্থানভেদে কয়েকটি জেলার লবণাক্ত মৃত্তিকায় বিভিন্ন শস্যের চাষ নিবিড়তা (%)

| ফসলের নাম | নোয়াখালি | | চট্টগ্রাম | | | খুলনা | | | বরিশাল | | | পটুয়াখালি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মধ্যম উঁচু জমি | মধ্যম নীচু জমি | উঁচু জমি | মধ্যম উঁচু জমি | মধ্যম নিচু জমি | উঁচু জমি | মধ্যম উঁচু জমি | মধ্যম নিচু জমি | উঁচু জমি | মধ্যম উঁচু জমি | মধ্যম নিচু জমি | উঁচু জমি | মধ্যম উঁচু জমি |
| ছিটানো আউশ | ১৪ | ৭ | ২০ | ২৩ | ১৩ | — | ৫ | — | ২৩ | ১৯ | — | ৮ | ৮ |
| উফশী আউশ | ১৬ | — | ১৩ | ৬ | — | — | — | — | — | — | — | ৩ | ২ |
| ছিটানো আমন | — | ৫০ | — | — | — | — | — | ৮৫ | — | ১৪ | ৭৯ | — | — |
| স্থানীয় রোপা আমন | ৬৫ | — | ১৩ | ৩৩ | ৮ | ৫৭ | ৭৯ | — | ৩৯ | ৭৪ | — | ৯৩ | ৯৯ |
| উফশী আমন | ১৫ | — | ২৯ | ১৪ | — | ২৬ | ৫ | — | ২ | — | — | ১ | — |
| পাট | — | — | — | — | — | ১ | ২ | ১ | — | — | — | — | — |
| আখ | — | — | ২ | — | — | — | — | — | ২ | ১ | — | — | — |
| ডাল শস্য | — | — | — | ১ | ১ | — | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ১ | ২ |
| তেল শস্য | — | — | — | ১ | ১ | ১ | ৩ | ২ | — | ১ | ১ | — | — |
| মশল্লা শস্য | ২ | — | ১ | ১ | — | — | — | — | — | — | — | ২ | ১ |
| শাক-সবজি | ২ | — | ১ | ৩ | ১ | — | ১ | — | — | ১ | — | ১ | ১ |
| ফল | — | — | ২ | — | — | ১৫ | — | — | ২৫ | — | — | ৬ | — |
| শস্য-নিবিড়তা (%) | ১১৪ | ৫৭ | ৮১ | ৮২ | ২৪ | ১০০ | ৯৬ | ৮৯ | ৯২ | ১১২ | ৮২ | ১১৫ | ১১৩ |

থেকে ২০ ভাগ জমিতে স্থানীয় জাতের রোপা আমন বনাম পতিত শস্যবিন্যাস অনুসরণ করা হয়। নোয়াখালি জেলার স্থানীয় জাতের রোপা আমন বনাম শীতকালীন শস্য চাষ (গম, আলু এবং শাক–সবজি) হচ্ছে প্রচলিত শস্যবিন্যাস।

উফশী জাতের ধান চাষে অঞ্চলভেদে বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি অঞ্চলে উঁচু এবং মধ্যম উঁচু শ্রেণীর বেশ পরিমাণ জমিতে উভয় মৌসুমেই উফশী জাতের ধান চাষ করা হয়। খুলনা অঞ্চলেও আমন মৌসুমে কিছু কিছু উঁচু জমিতে উফশী জাতের ধানের আবাদ দেখা যায়। কিন্তু খুলনা, বরিশাল এবং পটুয়াখালি অঞ্চলে উফশী আউশের চাষ খুবই কম। পটুয়াখালি এবং বরিশাল অঞ্চলে খুব অল্প পরিমাণ জমিতে উফশী ধানের চাষ হয়ে থাকে, যদিও এই দু'অঞ্চলের উঁচু এবং মধ্যম উঁচু শ্রেণীর জমিতে উফশী আমন চাষের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

## উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি কার্যক্রম উন্নয়নে বাঁধাসমূহ

উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত মৃত্তিকা উন্নয়নের পথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক, রাসায়নিক এবং সামাজিক কারণসমূহ বাধাস্বরূপ কাজ করে। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত কারণসমূহ এর জন্য দায়ী। কিছু কিছু কারণ এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হলো—

**১. লবণাক্ত মৃত্তিকা :** মৃত্তিকার লবণাক্ততাই সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলসমূহে আশানুরূপ শস্য চাষের প্রধানতম অন্তরায়, বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে। লবণাক্ততা কতকগুলি শস্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধিক্রম ও ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস করে থাকে, এমনকি কোনো কোনো সময় লবণের আধিক্য সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দেয়। উপকূলীয় অঞ্চলের বেশ কিছু জমি নিয়ত সমুদ্রের লবণাক্ত জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। এই সব লবণাক্ত মৃত্তিকায় সুষ্ঠুভাবে ফসল চাষ করার নিমিত্তে কোনো লাগসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হয়নি। ফলে ফসল চাষ করলেও ফলন খুব কম হয়ে থাকে।

**২. পুষ্টি উপাদানের অভাব :** লবণাক্ত মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, তামা এবং দস্তার খুবই অভাব, ফলে যথাযথ পরিমাণে সার ব্যবহার না করলে ভাল ফলন পাওয়া যায় না। অন্যদিকে আবার মৃত্তিকার নিম্ন ভৌত স্বভাবের কারণে ব্যবহৃত সার থেকে আশানুরূপ ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয় না।

**৩. ভাল গুণসম্পন্ন সেচের পানির অভাব :** ভাল গুণসম্পন্ন পর্যাপ্ত সেচের পানির অভাবে বিশেষ করে শুষ্ক, রবি মৌসুমে বোরো ধান, রবি শস্য এবং আউশ ধানের চাষাবাদ সীমিত হয়ে পড়ে।

**৪. প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা :** বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও অনিশ্চয়তা, আকস্মিক বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতি আউশ এবং আমন ধান চাষে বাধাস্বরূপ কাজ করে। কোনো কোনো সময় অত্যধিক বৃষ্টিপাত রোপা আমন বপনে বিলম্ব ঘটায়। কখনো আবার সামুদ্রিক বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস ফসলাদি ও ঘর–বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

৫. **লবণসহিষ্ণু ফসলের অভাব :** উপকূলীয় অঞ্চলে চাষকৃত শস্যের লবণ সহিষ্ণুতার বিস্তৃতি কম, ফলে এসব এলাকার জন্য লবণসহিষ্ণু শস্য বাছাইয়ের সুযোগও সীমিত। অন্যদিকে কোনো একটি ফসলের একই জাত বছরের পর বছর চাষ করার দরুণ এসব ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণও ঘটে বেশি। হিসপা, লিফ্‌হপার এবং টুংরো ভাইরাসের আক্রমণে প্রায় বছরই এসব অঞ্চলে ধানের অশেষ ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে।

৬. **স্বল্পকাল স্থায়ী শীত মৌসুম :** উপকূলীয় অঞ্চলে শীত মৌসুমের স্থায়িত্ব খুব কম। প্রায় প্রতি বছরই আমন ধান কাটা বিলম্ব হওয়ায় রবি ফসলের চাষও বিলম্বিত হয়ে পরে ফলে এসব ফসলের ফলন কমে আসে।

৭. **উদ্ধারকৃত জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব :** উপকূলীয় অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা সমুদ্র থেকে উদ্ধারকৃত বিভিন্ন ধরনের নিম্নভূমি (polder)। এসব নিম্নভূমির ব্যবস্থাপনা যেমন পানি গেট (sluice gate), বছরের বিভিন্ন সময়ে পানির উচ্চতা প্রভৃতি শস্য চাষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। ফলে এসব নিম্নভূমিতে উফশী জাতের আমন এবং আউশ ধানের চাষ সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া এসব নিম্নভূমি থেকে যথেচ্ছা খাল কেটে লবণাক্ত পানি ভিতরে নেয়ার ফলে স্বাভাবিক শস্য চাষ বিঘ্নিত হচ্ছে।

৮. **নিম্ন ভৌত স্বভাবের মৃত্তিকা :** উপকূলীয় অঞ্চলের অধিকাংশ মৃত্তিকা পলি এঁটেল থেকে এঁটেল শ্রেণীর অন্তর্গত। এ জাতীয় মৃত্তিকা শুকিয়ে গেলে ভীষণ শক্ত হয় এবং গভীর ও চওড়া ফাঁটলের সৃষ্টি হয়। এরূপ মৃত্তিকা কর্ষণ খবুই কষ্টসাধ্য। রোপা-আমন কাটার পর রবি ফসলের জন্য সময় খুব কম পাওয়া যায়। যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি জমি প্রস্তুতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যা অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

৯. **প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাঠকর্মীর অভাব :** লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাঠকর্মীর খুবই অভাব। আশানুরূপ ফলনলাভে সহায়ক লাগসই প্রযুক্তিরও অভাব। ফলে মাঠকর্মীগণ এসব এলাকায় যথাযথ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারছে না।

১০. **জমির মালিক বা বর্গাদারদের জমি উন্নয়নে অনীহা :** উপকূলীয় অঞ্চলের অধিকাংশ জমির মালিক বাইরে থাকে, নিজেরা চাষ করে না। জমির মালিক বা বর্গাদার কেউই জমির উন্নয়নপূর্বক আধুনিক চাষাবাদে উৎসাহী নয়।

১১. **যাতায়াত ও পণ্যের বিপণনে অসুবিধা :** এসব অঞ্চলে সুষ্ঠু যাতায়াত এবং কৃষিপণ্যের বিপণনে খুবই অসুবিধা, ফলে কৃষক সমাজ লবণাক্ত মৃত্তিকার উন্নয়নপূর্বক কৃষি উন্নয়নে তেমন আগ্রহী নয়।

সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালি এবং পিরোজপুর জেলায় কৃষি উন্নয়নের পথে যে সমস্ত সমস্যা বাধাস্বরূপ তা মোটামুটি একই ধরনের। এসব সমস্যা হলো সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থার অভাব, বর্গা পদ্ধতি, জমির মালিকদের গ্রামে অনুপস্থিতি, লবণাক্ততা,

ভারী-এঁটেল শ্রেণীর মৃত্তিকা এবং জমি ভাঙনের ঝুঁকি। সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট জেলার কিছু কিছু এলাকায় মৌসুমী প্লাবন শুরু ও শেষ হওয়ার সময়ের অনিশ্চয়তা, খরার ঝুঁকি, জলাবদ্ধতা, বৃষ্টিপাতের তারতম্য, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির অভাব এবং মৃত্তিকায় দস্তার ব্যাপক অভাব প্রধান সমস্যারূপে চিহ্নিত।

সমস্ত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং ফেনী জেলার কিছু অংশে সুষ্ঠু কৃষি উন্নয়নের পথে সমস্যা হচ্ছে লবণাক্ততা, অত্যধিক মৌসুমী বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিবাত্যাসহ জলোচ্ছ্বাস, মন্দ যাতায়াত ব্যবস্থা এবং দক্ষিণাংশে জমির বড় বড় মালিকানাস্বত্ত্ব। কক্সবাজার জেলার কিছু কিছু অনুর্বর মৃত্তিকা, কম পানিধারণ ক্ষমতা এবং ভাল গুণসম্পন্ন সেচের পানির অভাব এ এলাকায় কৃষি উন্নয়নে বাধা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর, ফেনী এবং চাঁদপুর জেলার সমস্যা কম-বেশি উপরোক্ত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং ফেনী জেলার মতোই। তবে এসব এলাকায় নদী ভাঙন সমস্যা অধিকতর প্রকট। এলাকাভেদে উপরোক্ত সমস্যাগুলো বিশেষ করে কিছু কিছু প্রাকৃতিক এবং সামাজিক সমস্যা উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দূরীভূত করে দেশকে কৃষি উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

### শস্যের লবণ সহিষ্ণুতা

সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলে প্রধানত বিভিন্ন ধরনের লবণ উদ্ভিদের মূলঅঞ্চলসহ মৃত্তিকার সর্বত্র পুঞ্জীভূত হওয়ার কারণে ফসল উৎপাদনে ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে মৃত্তিকা দ্রবণের ঘনত্ব আশঙ্কাজনক মাত্রায় বাড়িয়ে গাছের ক্রমবৃদ্ধি ব্যবহত করে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে এই অবস্থা তীব্র আকার ধারণ করে। এ সময় বাষ্পীভবন খুব বেশি হয়, ফলে মৃত্তিকা দ্রবণের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মৃত্তিকায় রস থাকা সত্ত্বেও গাছ তা গ্রহণ করতে পারে না। এ অবস্থায় অতিরিক্ত পানি প্রয়োগের মাধ্যমে লবণের ঘনত্ব কমিয়ে এবং চুয়ানো প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে গাছের বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা যেতে পারে। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত এবং পানিতে জমি প্লাবিত হওয়ায় পুঞ্জীভূত লবণের ঘনত্ব কমে ছোট ছোট খাল-খন্দ দিয়ে পানির সাথে বাইরে অথবা চুয়ানো প্রক্রিয়ায় মূল অঞ্চলের নিচেচলে যায়, ফলে বর্ষা মৌসুমে লবণাক্ত এলাকায় ফসল চাষ সম্ভব হয়ে উঠে।

কিন্তু সমস্যা হলো, পৃথিবীতে চাষকৃত বহু শস্যই লবণাক্ত মৃত্তিকায় জন্মিতে সক্ষম নয়। কিছু কিছু শস্য অবশ্য এর ব্যতিক্রম। এরা মৃত্তিকায় লবণের ঘনত্বের তারতম্যের মধ্যেও ভাল ফলন দিতে পারে অর্থাৎ এসব ফসল লবণের একটা বিশেষ ঘনত্ব পর্যন্ত ভাল ফলন দিতে সক্ষম। কারণ এই শ্রেণীর শস্যের একটি বিশেষ গুণ হলো এরা শিকড়ের সাহায্যে মৃত্তিকার ঘন দ্রবণও টেনে নিতে পারে। চিত্র ১২-এ বিভিন্ন ফসলের ফলনের উপর লবণাক্ত মৃত্তিকার বিদ্যুৎ পরিবাহিতার প্রভাব দেখানো হয়েছে।

এতে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ৫-এর কাছে গেলেই আলু, চীনাবাদাম, পিঁয়াজ, মিষ্টি আলু, গো-মোটর, মূলা প্রভৃতি ফসলের ফলন প্রায় ৫০ ভাগ হ্রাস পায় অর্থাৎ এসব

ফসলের লবণ সহিষ্ণুতা খুব কম। অন্যদিকে বার্লি, তুলা, জোয়ার, সূর্যমুখী, বারমুডা ঘাস, সুদান ঘাস প্রভৃতি শস্যের লবণ সহিষ্ণুতা বেশি, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ১৫-তেও এসব ফসল মোটামুটি ভাল ফলন দিতে পারে। এছাড়া খেজুর, নারিকেল, বীট, সুপারি প্রভৃতি গাছও খুব লবণসহিষ্ণু। ধান, গম, সয়াবিন, টমেটো, বাঁধাকপি, পালংশাক, ব্রোকলি প্রভৃতি ফসল মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্গত। উল্লেখ্য যে বয়স্ক তুলা গাছ লবণসহিষ্ণু হলেও এর বীজ অঙ্কুরোদ্গম এবং প্রাথমিক অবস্থায় বৃদ্ধি নিম্ন বিদ্যুৎ পরিবাহিতা মান দ্বারাও বেশ ব্যাহত হয় (সারণি ১৫ দ্রষ্টব্য)।

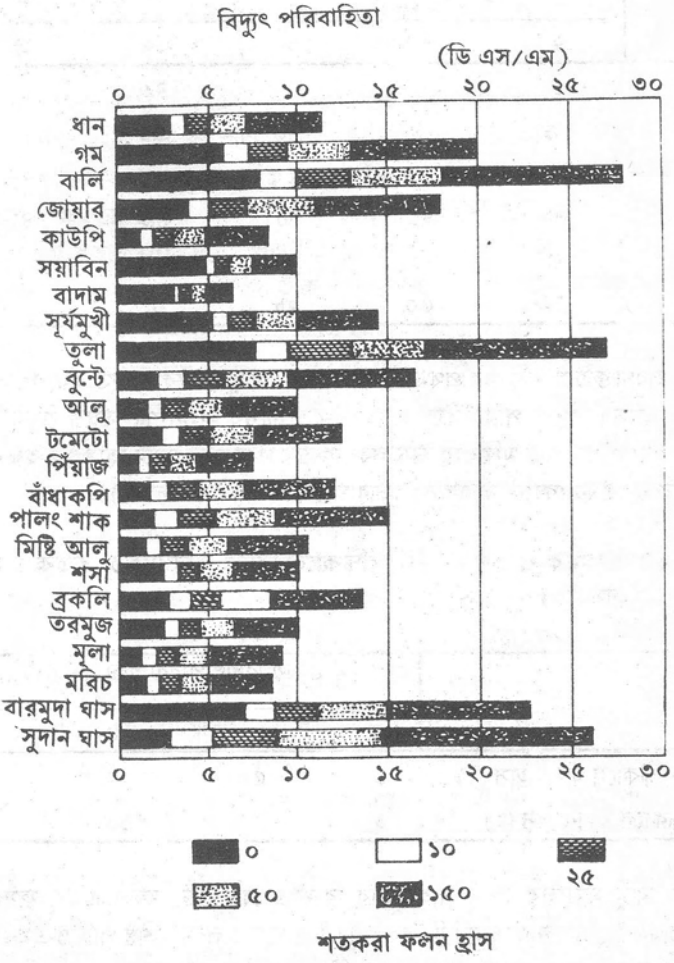


চিত্র ১৪ : বিভিন্ন ফসলের ফলনের উপর লবণাক্ত মৃত্তিকার বিদ্যুৎ পরিবাহিতার প্রভাব।

অধিকাংশ ফসলের বীজ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা এবং প্রাথমিক অবস্থায় বৃদ্ধি লবণাক্ততা দ্বারা ব্যাহত হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ পরিবাহিতা মান ৮–এ প্রায় সব ফসলেরই অঙ্কুরোদগম ৫০ ভাগের নিচে নেমে আসে (সারণি ১৫ দ্রষ্টব্য)। বিদ্যুৎ পরিবাহিতা মান ১২–তে একমাত্র ভুট্টা ছাড়া অন্যান্য ফসলের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।

**সারণি ১৫ : বীজের অঙ্কুরোদ্গমের (%) উপর বিদ্যুৎ পরিবাহিতার প্রভাব**

| ফসলের নাম | মৃত্তিকায় বিদ্যুৎ পরিবাহিতা মান ($ds\ m^{-1}$) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ২ | ৪ | ৮ | ১২ | ১৬ |
| ধান | ৮২ | ৭৮ | ৪৭ | ৪৩ | ৫ |
| গম | ৭১ | ৭৪ | ৪৪ | ৩০ | -- |
| বার্লি | ৭৩ | ৬৩ | ৫৫ | ৩৫ | -- |
| ভুট্টা | ৭২ | ৭৩ | ৭০ | ৪৯ | ৪৮ |
| সরিষা | ৭৬ | ৭৩ | ৩০ | ২২ | -- |
| তুলা | ৬৮ | ৫০ | ২৮ | ৬ | -- |

উচ্চ লবণাক্ততায় উদ্ভিদের প্রথম দিকের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, ফলে ফলন খুব কমে আসে। বিদ্যুৎ পরিবাহিতা মান ১৪–তে ধানের ফলন ৭৫ ভাগে নেমে আসে। পক্ষান্তরে বয়স্ক ধান গাছ মৃত্তিকার উচ্চ লবণাক্ততার কারণে ততোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং ফলনের উপর তেমন কোনো মারাত্মক প্রভাব পরে না (সারণি ১৬ দ্রষ্টব্য)।

**সারণি ১৬ : প্রাথমিক ও জননকালীন বৃদ্ধিকালে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা কর্তৃক ফলন হ্রাস (%)**

| বৃদ্ধিকাল | মৃত্তিকায় বিদ্যুৎ পরিবাহিতা মান ($ds\ m^{-1}$) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ৩ | ৮ | ১৪ | ২১ |
| প্রাথমিক বৃদ্ধিকালে ফলন হ্রাস (%) | ০ | ৫০ | ৭৫ | ৯৬ |
| জনন বৃদ্ধিকালে ফলন হ্রাস (%) | ০ | ০ | ১০ | ৫২ |

কিছু কিছু ফসলের লবণ সহিষ্ণুতার বিস্তৃতি বেশ বড়, ফলে এসব ফসল উচ্চ লবণাক্ততায়ও সন্তোষজনক ফলন দিতে পারে। উচ্চ মাত্রার লবণবিশিষ্ট পানিও এসব ফসলে সেচ কার্যে ব্যবহার করা যায়। বুনটভেদে মৃত্তিকার সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক ফসল নির্বাচন লবণাক্ত মৃত্তিকায় ফলন আশানুরূপ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ফেব্রুয়ারি–মে'র শুষ্ক আবহাওয়ায় অতিরিক্ত বাষ্পীভবনহেতু উপকূলীয় অঞ্চলের মৃত্তিকার উপরিস্তরে অধিকতর লবণ জমা হয়। সম্ভব হলে এসময় পানিসেচের মাধ্যমে লবণ চলাচলের উর্ধগতি রোধ করে মৃত্তিকার উপরিস্তরে লবণের ঘনত্ব কমানো যায়। উপকূলীয় অঞ্চলের কোনো কোনো এলাকায় ভাল গুণবিশিষ্ট ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি পাওয়া যায়। এসব পানি ফসলে সেচ দেয়ার জন্য খুবই উপযোগী। যে সব এলাকায় প্রধানত চুয়ানো প্রক্রিয়ায় লবণ দূরীভূত করে শস্য চাষ করা হয়, সেসব এলাকায় এরূপ পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে সেচ দিয়ে লবণ দূর করা যেতে পারে।

## লবণাক্ত এলাকার ফসল উপযোগিতা এবং চাষোপযোগী জমির পরিমাণ নির্ণয়

উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন নিয়ামক সম্মিলিতভাবে শস্য উৎপাদনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এর মধ্যে লবণের তীব্রতা এবং ভাল গুণসম্পন্ন সেচের পানির অভাবই প্রধান। এসব অঞ্চলে ১২টি শস্য উৎপাদন প্রভাবী নিয়ামক এ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো ১. মৃত্তিকায় লবণাক্ততার তীব্রতা, ২. মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা, ৩. মৃত্তিকার পানি অনুপ্রবেশ ক্ষমতা, ৪. পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ৫. মৌসুমী প্লাবনের গভীরতা, ৬. মৃত্তিকা বুনট, ৭. মৃত্তিকার $P^H$, ৮. মৃত্তিকায় পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা, ৯. মৃত্তিকার কার্যকরী গভীরতা, ১০. প্লাবনে ফসল ক্ষতির ঝুঁকি, ১১. মৃত্তিকা ক্ষয় এবং ১২. স্থানীয় জলবায়ু।

উপরোক্ত নিয়ামকগুলোর উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন ফসলের থানাওয়ারী চাষোপযোগী জমির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে (সারণি ১৭ দ্রষ্টব্য)। কৃষি উন্নয়নে জড়িত সকলের জন্যই এ তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এটি বিশদভাবে আলেচনা করার প্রচেষ্টা নেয়া হলো।

সাতক্ষীরা জেলার সব থানার জন্যই সবচেয়ে উপযোগী ফসল হলো স্থানীয় জাতের রোপা আমন, এরপর উফশী জাতের আমন। কিন্তু সাতক্ষীরা সদর, তালা, আশাশুনি এবং কালিগঞ্জ থানায় সরিষা, টমেটো, বোনা আউশ, কাউন, গম এবং রোপা আউশ চাষের সম্ভাবনাও ভাল। শ্যামনগর থানায় কেবল ৪টি ফসল, যথা— স্থানীয় জাতের রোপা আমন, উফশী জাতের আমন, সরিষা এবং উফশী জাতের রোপা আউশ চাষ করা যেতে পারে। দেবহাট্টা থানার বেশ পরিমাণ এলাকা রবি চীনাবাদাম, সরিষা, মশুর, স্থানীয় জাতের রোপা আমন এবং উফশী জাতের আমন চাষের উপযোগী।

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, কয়রা এবং পাইকগাছা থানা স্থানীয় জাতের রোপা আমন চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী এবং তারপরই উপযোগী ফসল হলো উফশী জাতের আমন। রূপসা থানায় সবচেয়ে উপযোগী ফসল দেশী পাটের পরই মরিচ অথবা রবি বজরা চাষের সম্ভাবনা ভাল। খুলনা জেলার সব ক'টি থানাতেই উফশী জাতের রোপা আউশ চাষের সম্ভবনাও উজ্জ্বল। এ জেলায় চতুর্থ ফসল হিসেবে বোনা আউশ চাষ করা যায়। দাকোপ এবং কয়রা থানায় ফসল চাষ স্থানীয় জাতের রোপা আমন, উফশী জাতের রোপা আমন, উফশী জাতের রোপা আউশ এবং বোনা আউশ, এই ৪টির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য ৪টি থানায় রবি মৌসুমে সরিষা, মশুর এবং চীনাবাদাম চাষ করা যেতে পারে।

সারণি ১৭ : বাংলাদেশের লবণাক্ত মৃত্তিকাঞ্চলে থানাওয়ারী ফসল চাষোপযোগী জমির পরিমাণ (হে:)

| জেলা ও থানা | স্থানীয় রোপা আমন | স্থানীয় রোপা আউশ | উফশী রোপা আমন | উফশী রোপা আউশ | বোনা আউশ | গভীর পানির আমন | গম | জোয়ার (কে/আর) | ভূট্টা (কে/আর) | মিলেট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **সাতক্ষীরা** | | | | | | | | | | |
| ১. আশাশুনি | ৭৬৭৭ | -- | ৪০৪৮ | ৭১৩ | ১০৪৪ | -- | ১০১০ | -- | ১০১০ (আর) | ১০১০ |
| ২. দেবহাটা | ৬১২২ | -- | ৪৬৬৪ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ৩. কালীগঞ্জ | ৫৮৩০ | ৯১৮ | ৪১৭২ | -- | ২৯২২ | -- | ৭০২ | -- | -- | ৯১৮ |
| ৪. সাতক্ষীরা | ১৩১৭৯ | ৮০৩ | ১১৫৯২ | -- | ২১৭৮ | -- | ২০৯২ | ১০০৭ (আর) | ২০৯২ (আর) | ২০৯২ |
| ৫. শ্যামনগর | ৩৫২৮ | -- | ২৪৯৭ | ৮৫৯ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ৬. তালা | ১৭২৯৮ | ৫৩৬ | ১৫৬৯১ | -- | ১১০৬৭ | -- | ১০৯২৩ | ৬৩৫৮ (আর) | ১০৯২৩ (আর) | ১১০৬৭ |
| **খুলনা** | | | | | | | | | | |
| ৭. বটিয়াঘাটা | ৮৪৫০ | -- | ৪০১৭ | ১৬৫০ | ৯৮৭ | -- | -- | -- | -- | -- |
| ৮. দাকোপ | ৫০৫৯ | -- | ৩৩১৩ | ২০৭৯ | ১৪৯৭ | -- | -- | -- | -- | -- |
| ৯. ডুমুরিয়া | ২০৯৫২ | ৬৫৩ | ৮৮০৮ | ৪০৩৯ | ৪৬৬০ | ৪৩৭৯ | ২১০৬ | -- | ২১৪৫ (আর) | ২২৮৩ |
| ১০. কয়রা | ৩৫৬২ | -- | ১৬৩৯ | ১৫৬১ | ৫৩৯ | -- | -- | -- | -- | -- |
| ১১. পাইকগাছা | ৮৬৩৯ | -- | ৫৯০৮ | ২২৬৫ | ৪২৮৬ | ১০৮৪ | ২৮৬৪ | ৫৭৮ (আর) | ৩১৮৩ (আর) | ৩১৮৩ |
| ১২. রূপসা | ১৮১৮ | ২৬৮৩ | ২৬৮৩ | - | -- | ১৮২৬ | -- | ২৭১৫ (আর) | -- | ৩৫৭৮ |
| **বাগেরহাট** | | | | | | | | | | |
| ১৩. বাগেরহাট | ১৫১০০ | ২২৭৫ | ৭১৪৬ | ২৬১৮ | ৬৭৯০ | ৪৪২৮ | ৫৮১ | -- | ২৯৪৫ (আর) | ৩০৬৬ |
| ১৪. ফকিরহাট | ৮৩৯২ | ৯৯৮ | ৫৩৯৮ | ১৫৯৪ | ৬১৮৬ | ২১৮০ | -- | -- | ২৫৪২ (আর) | ২৬৪২ |
| ১৫. কচুয়া | ৯০০৩ | ৩০৬২ | ২৩৪৯ | ১৪০২ | ১৭২২ | ২৮৩২ | ৬২৩ | -- | ৫৮৯ (আর) | ৬৮৬ |
| ১৬. মংলা বন্দর | ৭১৮৭ | -- | ৬৪৫৭ | ৫৬৫৮ | ৫৪১৬ | -- | -- | -- | -- | -- |
| ১৭. মোড়েলগঞ্জ | ১৭২৬৯ | ৩১৭৯ | ১০২৭৭ | ৯৮১০ | ৮৮১৯ | ২৬৭৭ | -- | -- | -- | -- |
| ১৮. রামপাল | ১৭২৯৬ | ১৩২৮ | ৯১৯২ | -- | ৭৫২৫ | ২৪৯০ | -- | -- | ২৯৫ (আর) | ৫৯৫ |
| ১৯. শরনখোলা | ৫৬২৯ | -- | ৫১১৭ | ৪৯৪৭ | ৪৭৭৭ | -- | -- | -- | -- | -- |
| **বরগুনা** | | | | | | | | | | |
| ২০. আমতলী | ৫১০৮ | ৫১০৮ | ১২৫০৬ | ১২৫০৬ | -- | ২৮৫৩ | -- | ৩০৫৬ (আর) | -- | ৮২৯৪ |
| ২১.বাননা | ৭৭৯৬ | ৩০০৭ | ২৪৯৬ | ১৮৭৯ | ১৩৫৫ | ৯১২ | -- | -- | -- | ৭৪৫ |
| ২২. বরগুনা | ৪২৪৬ | ২৩৯২ | ৬৭০৬ | ৬৬৪৭ | -- | ২২১৪ | -- | ২৯৫৬ (আর) | -- | ৫৮৭১ |
| ২৩. বেতাগী | ১৮১৪ | ১১১০ | ২২২০ | ২২২০ | -- | ১৩৮৬ | -- | ২৩০৬ (আর) | -- | ৩৫২২ |
| ২৪. পাথরঘাটা | ১৯৮৭৭ | ৭৭৭৬ | ৬৬৮৯ | ৫৫১৯ | ৬৯৫ | ৯১৯২ | -- | -- | -- | ৭৫৮ |

সারণি ১৭ : বাংলাদেশের লবণাক্ত মৃত্তিকাঞ্চলে থানাওয়ারী ফসল চাষোপযোগী জমির পরিমাণ (হে:)

| মশুর | সরিষা | সয়াবিন (কে/আর) | চীনাবাদাম (কে/আর) | বাঁধাকপি/ভুল কপি | টমেটো | মরিচ (কে/আর) | পাট (সি/ও) | তরমুজ | তুলা (কে/আর) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৩৮১ | ১৩৮১ | ১০৪৪ | ২০৫৪ | -- | ১০৪৪ | -- | ১০৪৪ (সি) | -- | -- |
| ১৩৭১ | ১৪০৪ | -- | ২৫৪৮ (আর) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ৩৩৫২ | ৩৬৮৬ | ২১৭৮ (আর) | ৩৮২৫ (আর) | -- | ২১৭৮ | -- | ২১৭৮ (সি) | -- | -- |
| ৭২০২ | ৭৯৩৯ | ২১৭৮ (আর) | ১০০১৫ (আর) | -- | ২১৭৮ | -- | ২১৭৮ (সি) | -- | -- |
| -- | ১০৫০ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ১৩২৭৩ | ১৩৩২২ | ১০৯২৩ (আর) | ১৪৯৮৪ (আর)-১৬৬০(কে) | -- | ১০৯২৩ | -- | ১০৯৭৭(সি)-১০৯২৩(ও) | -- | ১৬৬০ (আর) |
| ৬৬৯ | ৬৬৯ | -- | ৬৬৯ (আর) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ৪৫২৩ | ৪৫৯১ | ২২০৫ (আর) | ৫৩৬২ (আর) | -- | ২২০৫ | -- | ২১৬৪(সি)-২১০৭(ও) | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ৩৪৭১ | ৪০৩৭ | ৩১৮৩ (আর) | ৩৪৭১ (আর) | -- | ৩১৮৩ | -- | ৩১৮৩(সি) | -- | -- |
| ৯৭৩ | ৯৭৩ | -- | ৯৩৫ (আর) | ৯৩৫ | -- | ২৭১৪ (আর) | ৪৩৪০(সি)-৯৩৫(ও) | ৯৩৫ | -- |
| ৬১৪৭ | ৬২২৮ | ৩০৬৫ (আর) | ৬১৪৭ (আর) | -- | ৩০৬৫ | -- | ৩০২৪(সি)-২৯৪২(ও) | -- | -- |
| ৬০৮৬ | ৬৯২৩ | ২৬১৭ (আর) | ৬০৮৬ (আর) | -- | ২৬০৭ | -- | ২৬৮২(সি)-২৫২৯(ও) | -- | -- |
| ১২১৩ | ১২৭৪ | ৬২৩ (আর) | ১১৩০ (আর) | -- | ৬২৩ | -- | ৬৫২(সি)-৫৮৯(ও) | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ৩৯৭১ | ৩১৭১ | ৫৯৫ (আর) | ৩৯৭১ (আর) | -- | ৫৯৫ | -- | ১১২৮(সি)-৫৯৫(ও) | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ১৬৮৯ | ১৬৮৯ | -- | -- | -- | -- | ৩০২৬ (আর) | ২৬৩১(সি) | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ৪৩৮ (আর) | -- | -- | -- |
| ১২৬৪ | ১২৬৪ | -- | -- | -- | -- | ২২৯৫ (আর) | ১২৩১(সি) | -- | -- |
| ৭০৪ | ৭০৪ | -- | ৫৯৮ (আর) | ৫৯৮ | -- | ২৩০৬ (আর) | ৩১৪২(সি)-৫৯৮(ও) | ৫৯৮ | -- |
| ৭০৮ | ৭০৮ | -- | -- | -- | -- | ১১৯৪ (আর) | -- | -- | -- |

সারণি ১৭ : বাংলাদেশের লবণাক্ত মৃত্তিকাঞ্চলে খানাওয়ারী ফসল চাষোপযোগী জমির পরিমাণ (হে:)

| জেলা ও থানা | স্থানীয় রোপা আমন | স্থানীয় রোপা আউশ | উফশী রোপা আমন | উফশী রোপা আউশ | বোনা আউশ | গভীর পানির আমন | গম | জোয়ার (কে/আর) | ভুট্টা (কে/আর) | মিলেট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **পটুয়াখালি** | | | | | | | | | | |
| ২৫.দশমিনা | ১৪৭০ | ১১৭৬ | ২৮৬৬ | ২৮৬৬ | -- | ৪১৯৭ | -- | ১৫৪১ | -- | ১৬৬০ |
| ২৬. গলাচিপা | ৩০৫৩ | ১৪৫০ | ৮২৯১ | ৮২৯১ | -- | ৩২০৫ | -- | ১১৮৮ (আর) | -- | ২৯৭০ |
| ২৭. কলাপাড়া | ৪১৫৬ | ২০৭৮ | ১০৩৮৬ | ১০৩৮৬ | -- | ২০৭৮ | -- | ১৫৩৭ | -- | ৪৯৩৫ |
| ২৮. মির্জাগঞ্জ | ১৮১৮ | ৯৩৫ | ২৬৮৩ | ২৬৮৩ | -- | ১৮২৬ | -- | ২৭১৫ (আর) | -- | ৩৫৭৮ |
| ২৯. পটুয়াখালি | ৩৪৬৭ | ১৮৫৮ | ৭০০৫ | ৭০০৫ | -- | ৩৭৪৫ | -- | ৫৪০২(আর) | -- | ১০৩৮৩ |
| **ভোলা** | | | | | | | | | | |
| ৩০. চরফেশন | -- | -- | -- | -- | -- | ১৫১২১ | -- | ১১৮৪৮ (আর) | -- | ১১৮৪৮ |
| ৩১. দৌলতখান | -- | -- | -- | -- | -- | ১০৬৭২ | -- | ১০৫৮৮ (আর) | -- | ১০৫৮৮ |
| ৩২. লালমোহন | -- | ১৩৫৪ | ১৩৫৪ | ১৩৫৪ | -- | ১৬৬৪৭ | -- | ৬৮৩০ (আর) | -- | ৭৫১৯ |
| ৩৩. মনপুরা | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ৩৪. তজিমুদ্দিন | -- | ৩৪৫১ | ৩৪৫১ | ৩৪৫১ | -- | ৫৬৭৪ | -- | ৩৪৫১ (আর) | -- | ৫৬৭৪ |
| **পিরোজপুর** | | | | | | | | | | |
| ৩৫. ইন্দ্ররকাঠি | ৫৯১৩ | ২০৫৩ | ২৩৪৯ | ১৩৭৬ | ২০৬৭ | ৯১৩ | -- | ৫১১ (আর) | -- | ৮৩১ |
| ৩৬. মঠবাড়িয়া | ২৮০৯৯ | ১০৬১৫ | ১০৩৩২ | ৭৯১১ | ৪৩৯৩ | ১২২১ | -- | -- | -- | ১৯২৬ |
| **চট্টগ্রাম** | | | | | | | | | | |
| ৩৭. আনোয়ারা | ৫৭৩৮ | ৫৭৩৮ | ৭৫০০ | ৭৫০০ | -- | ৯০২ | -- | -- | -- | -- |
| ৩৮. বাঁশখালি | ৫২৯০ | ৫৩৮২ | ৮০৮৩ | ৮১৭৫ | -- | ১২৪৫ | -- | -- | -- | -- |
| ৩৯. ডবল মুরিংস | -- | -- | -- | -- | -- | ১১৯৩ | -- | -- | -- | -- |
| ৪০. মিরের-শরাই | ৫২৪০ | ১৫১৭ | ১২০৭ | ১২০৭ | -- | ১৫০৩৯ | -- | -- | -- | ৪৩৪৫ |
| ৪১. পতেঙ্গা | -- | -- | -- | -- | -- | ১৩৭০ | -- | -- | -- | -- |
| ৪২. পটিয়া | ৭৫৫২ | ৭৫৫২ | ১০৩২০ | ১০৩২০ | -- | ৪৬২৫ | -- | -- | -- | -- |
| ৪৩. সন্দীপ | -- | -- | ৩৪৭৪ | ৩৪৭৪ | -- | ১০৫৫৩ | -- | ৭৩৪ (আর) | -- | ৬৬০১ |
| ৪৪. সিতাকুণ্ড | ২৭০৪ | -- | ৭১৩ | ৭১৩ | -- | ৭০৯৩ | -- | -- | -- | ১৯১২ |
| **কক্সবাজার** | | | | | | | | | | |
| ৪৫. চকরিয়া | -- | -- | ১১৬২ | ১৫২৯ | -- | ২২৮৯ | -- | -- | -- | ১৪৮০ |
| ৪৬. কক্সবাজার | -- | -- | ৫৭৯ | ৭৩৫ | -- | ১১৪৬ | -- | -- | -- | -- |
| ৪৭.কুতুবদিয়া | -- | -- | ১১৭৭ | ১৫৪৫ | -- | ১১০৩ | -- | -- | -- | -- |
| ৪৮. মহেশখালী | -- | -- | ৮৭৯ | ১০০৮ | -- | ৬৬৪ | -- | -- | -- | -- |
| ৪৯. রামু | -- | -- | ১৩২৮ | ১৩২৮ | -- | ১৮৭০ | -- | -- | -- | ১০৪৪ |

সারণি ১৭ : বাংলাদেশের লবণাক্ত মৃত্তিকাঞ্চলে খানাওয়ারী ফসল চাষোপযোগী জমির পরিমাণ (হে:)

| মশুর | সরিষা | সয়াবিন (কে/আর) | চীনাবাদাম (কে/আর) | বাঁধাকপি/ফুল কপি | টমেটো | মরিচ (কে/আর) | পাট (সি/ও) | তরমুজ | তুলা (কে/আর) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬৬০ | ১৬৬০ | -- | ১৫৪১ | ১৫৪১ | -- | ১৫৪১ (আর) | ৪০৩১(সি)-১৫৪১(ও) | ১৫৪৯ | -- |
| ১১৭২ | ১১৭২ | -- | -- | -- | -- | ১১৮৮ (আর) | ২৪০৭(সি) | -- | -- |
| ১২৪৬ | ১২৪৬ | -- | -- | -- | -- | ১৫৩৭ (আর) | ১২৪৬(সি) | -- | -- |
| ৯৭৩ | ৯৭৩ | -- | ৯৩৫ (আর) | ৯৩৫ | -- | ২৭১৫ (আর) | ৪৩৪০(সি)-৯৩৫(সি) | ৯৩৫ | -- |
| ২০৭০ | ২০৯২ | -- | ২০৯০ (আর) | ২০৯০ | -- | ৫৪০২ (আর) | ১০৫২৪(সি)-২০৯০(ও) | ২০৯০ | -- |
| ১১৮৪৮ | ১১৮৪৮ | -- | -- | ১১৪৮৪ | ১১৪৮৪ | ১১৪৮৪ (আর) | ১১৪৮৪(সি)১১৪৮৪-৮৪(ও) | ১১৪৮৪ | -- |
| ১০৫৮৮ | ১০৫৮৮ | -- | ১০৫৮৮ | ১০৫৮৮ | -- | ১০৫৮৮ (আর) | ১৩৪২(সি)-১৩৪২(ও) | -- | -- |
| ৭৫১৯ | ৭৫১৯ | -- | ৬৮৩০ (আর) | ৬৮৩০ | -- | ৬৮৩০ (আর) | ৫৬০৭(সি)-৫৫১২(ও) | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ২৮৫৪ (আর) | -- | -- | -- |
| ৫৬৭৪ | ৫৬৭৪ | -- | ৩৯১৯ (আর) | ৩৯১৯ | -- | ৩৯১৯ (আর) | -- | -- | -- |
| ৯১০ | ১০৭৬ | -- | ৮৮০ (আর) | -- | -- | ১২৬৪ (আর) | -- | -- | -- |
| ১৫৫৮ | ১৫৫৮ | -- | -- | -- | -- | ১২৬৪ (আর) | -- | -- | -- |
| -- | ৬২৯ | -- | -- | -- | -- | ১৫১১ (আর) | -- | -- | -- |
| -- | ২০২৩ | -- | -- | -- | -- | ১৫১১ (আর) | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ২৯৫১ (আর) | -- | -- | -- |
| -- | ৭২০১ | -- | -- | -- | -- | ৩৭২৫(আর) | ৮৭৮২(সি) | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | ২৮০২ | -- | -- | -- | -- | ৭৭০৬ (আর) | -- | -- | -- |
| ২৪৮৯ | ৬৬০১ | -- | -- | ৭৩৪ | -- | -- | ৪২০৮(সি)-২২০৩(ও) | -- | -- |
| -- | ৪২০৭ | -- | -- | -- | -- | ৫২৬৭ (আর) | ৭২৭(ও) | -- | -- |
| ১০৬০ | ৪৯০০ | -- | ১০৬০ | -- | -- | ৪৭২২ (আর) | -- | -- | -- |
| -- | ৯৪১ | -- | -- | -- | -- | ১৭০১ (আর) | -- | -- | ৩৭০০ |
| -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ১৫৮২ |
| -- | ৮০০ | -- | -- | -- | -- | ১১২৯ (আর) | -- | -- | -- |
| ৮০২ | ৩৪৫৪ | -- | ৮০২ | -- | -- | ৪৭৭৫ (আর) | -- | -- | -- |

BANSDOC Library Dhaka

সারণি ১৭ : বাংলাদেশের লবণাক্ত মৃত্তিকাঞ্চলে থানাওয়ারী ফসল চাষোপযোগী জমির পরিমাণ (হে:)

| জেলা ও থানা | স্থানীয় রোপা আমন | স্থানীয় রোপা আউশ | উফশী রোপা আমন | উফশী রোপা আউশ | বোনা আউশ | গভীর পানির আমন | গম | জোয়ার (কে/আর) | ভুট্টা (কে/আর) | মিলেট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫০. টেকনাফ | -- | -- | -- | -- | -- | ৬০৩ | -- | -- | -- | -- |
| ৫১. উখিয়া | -- | -- | ৯০০ | ৯০৮ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **নোয়াখালি** | | | | | | | | | | |
| ৫২. বেগমগঞ্জ | ৩৭৪৩ | ২৫২৭ | -- | -- | ২৪২৯ | ২৯৪৭৮ | ৪০৪৬ | ৪৩৭১ (আর) | ১১১৬৬ (আর) | ১২৯৯২ |
| ৫৩. কোম্পানিগঞ্জ | ৩৯৬৭ | -- | -- | -- | -- | ১৯৩৪ | -- | -- | ৬১৮ (আর) | ৩০৮৪ |
| ৫৪. হাতিয়া | ১০৪১ | -- | -- | -- | -- | ২৪৯৪২ | -- | -- | -- | -- |
| ৫৫. নোয়াখালি | ২০৪২২ | -- | -- | -- | -- | ৪৬২৪৪ | -- | -- | -- | ১৬০৮৭ |
| ৫৬. সেনবাগ | ৪৮৯৮ | ৩০৮৮ | -- | -- | ৪৯১৫ | ১২০৪৪ | ৪৮২৩ | ৪৯৬৪ | ৭৭১১ (আর) | ৭৭১ |
| **লক্ষ্মীপুর** | | | | | | | | | | |
| ৫৭. লক্ষ্মীপুর | ১৯৯৬৪ | ১৩৩৫৮ | ৩১৩১ | ৩১৩১ | ৯৪৪১ | ৩১০৫৬ | ৬৬৫৩ | ৫৩৮৩ | ১৫৩৩১ (আর) | ১৮৩৯৯ |
| ৫৮. রায়পুর | ১০৫৮৬ | ৮৫৭১ | ২০৭৯ | ২০৭৯ | ৭০৩০ | ৯৮৩১ | ৩৩৫৬ | ২৩৪৩ | ৬৫৩৬ (আর) | ৬৫৩৬ |
| ৫৯. রামগতি | ৮৪৪১ | -- | -- | -- | -- | ২৫০১০ | -- | -- | -- | ৮৪০০ |
| **ফেনী** | | | | | | | | | | |
| ৬০. ছাগলনাইয়া | ১০২২ | ১০৮৭ | ১৭১৩ | ১৭১৩ | -- | ৮৫৪৭ | ২০২১ | ১২৯৮ (আর) | ৩৬১৯ (আর) | ৩৮৪৭ |
| ৬১. দাগনভূইয়া | ২০৮২ | -- | -- | -- | ১৯৬৪ | ৯১৪৪ | ১৬৪৬ | ১৬১ (আর) | ৬০৮১ (আর) | ৫৬৮০ |
| ৬২. ফেনী | ৯৭৭৯ | -- | -- | -- | ৭১১৬ | ১২৪৯৯ | ৬৬৩৪ | ৬৫৪৭ | -- | ৯৫১৮ |
| ৬৩. সোনাগাজি | ৪৭২৫ | -- | -- | -- | ২২৮৬ | ৯১০৩ | -- | ২১৬৭ | ৪০৪২ (আর) | ৫৯৫৪ |
| **চাঁদপুর** | | | | | | | | | | |
| ৬৪. হাইমচর | ৩৩৩২ | ২১১৩ | ৯১৭ | ৯১৭ | ২৭২২ | ৫৪৬৯ | ১৩২১ | ১০৯১ | ১৮৮৬ (আর) | ৬২৯৮ |

সারণি ১৭ : বাংলাদেশের লবণাক্ত মৃত্তিকাঞ্চলে থানাওয়ারী ফসল চাষোপযোগী জমির পরিমাণ (হে:)

| মশুর | সরিষা | সয়াবিন (কে/আর) | চীনাবাদাম (কে/আর) | বাঁধাকপি/ফুল কপি | টমেটো | মরিচ (কে/আর) | পাট (সি/ও) | তরমুজ | তুলা (কে/আর) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ৭৭৯ | -- | -- | -- | -- | ১৩৭৭ (আর) | ৮৯৯(সি)-৭২৭(ও) | -- | -- |
| -- | ১৪৭৭ | -- | -- | -- | -- | ২৫৫১ (আর) | ৬৯৪(সি)-৬৭৫(ও) | -- | -- |
| ১১৬৬২ | ১৩৬৬৫ | ৩৫১০ (আর) | ১১৪৭৩ (আর) | ৪৫৩৩ | ৩৫১০ | ৩৫২১ (আর) | ১৮১৫৪(সি) | -- | -- |
| ৫৯৩০ | ৬০২৭ | -- | ১৮৮৮ (আর) | -- | -- | -- | ৩৫৪০(ও) | -- | -- |
| ১০২১২ | ১০২১২ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ৫৩২০ (সি) | -- |
| ১৩০০৭ | ১৬১৫২ | -- | -- | -- | -- | -- | ৫৭৮০(সি) | -- | -- |
| ৮২১২ | ৮৮৪৭ | ৪৬৮৪ (আর) | ৭৭১১ (আর) | ৫৩১৫ | ৪৬৮৪ | ৪৬৮৪ (আর) | ৭৮৩১(সি) | -- | -- |
| ২৩৮০৯ | ২৭৩২৬ | ১৯০৮ (আর) | ১৫৩৫১ (আর) | ৩৯১২ | ১৯০৮ | ২২৪২ (আর) | ১৬৩৮(সি)-৮০৬৯(ও) | ২৩৪৩ | ৩১৩১ (আর) |
| ১১৬৫৩ | ৮৭৭১ | -- | ৮০৫৩ (আর) | ৭০৩ | -- | -- | ৭৬৮১(সি)-৫৫৩৪(ও) | -- | ২০৭৯ (আর) |
| ৭৯৭৯ | ৮৪০০ | -- | -- | -- | -- | -- | ১৫১২(সি) | -- | -- |
| ৮৪২৩ | ৯৫৬২ | -- | ৯১০৪ (আর) | -- | -- | -- | ৯৮০৯(সি)-৬১৫৬(ও) | -- | -- |
| ৬৫৯১ | ৭৫৫৫ | ১৪৯৬ (আর) | ৬০৮১ (আর) | ১৮৯৫ | ১৪৯৬ | ১৪৯৬ (আর) | ৫৫৫৫(সি)-৩৫৮২(ও) | -- | -- |
| ৯৪৯৬ | ১৩১৯৩ | ৬০৭৭ (আর) | -- | ৬৩৬২ | ৬০৭৭ | ৬৩৫৯ (আর) | ১২১৪৫(সি)-৮০৭৯(ও) | -- | -- |
| ৬৬৬০ | ৭৯৫৮ | ১৯৬৩ (আর) | ৪১৫০ (আর) | ২৩৬২ | ১৯৬৩ | ২০৮৫ ২৫৯৯(ও) | ৪৯২৫(সি) | -- | -- |
| ৬২৯৮ | ৬৩৩৭ | -- | ৬২৯৮ (আর) ৯১৭(কে) | ৪৫৮৬ | -- | -- | ৩০৮৩(সি)-১৫৪২(ও) | -- | ৯১৭ (আর) |

বাগেরহাট জেলার সব থানায় প্রথম পছন্দের ফসল হিসেবে স্থানীয় জাতের রোপা আমন, উফশী জাতের আমন এবং বোনা আউশ চাষ করা যায়। বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, রামপাল এবং কচুয়া থানায় রবি চীনাবাদাম, কাউন, রবি ভুট্টা এবং পাট চাষের সম্ভাবনা ভাল। মোংলা বন্দর, মোড়েলগঞ্জ এবং শরনখোলা থানা স্থানীয় জাতের রোপা আমন, উফশী জাতের আমন এবং বোনা আউশ চাষের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া ব্যতীত অন্যান্য থানাতেই রবি মরিচ চাষের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এসব থানাতে দ্বিতীয় পছন্দের ফসল হলো সরিষা যা ব্যাপকহারে চাষ করা সম্ভব। কুতুবদিয়া থানায় চাষ সম্ভবনাময় ফসলের সংখ্যা খুবই কম, মাত্র ৩টি যথা–উফশী রোপা আউশ, আমন এবং গভীর পানির আমন। তাছাড়া এ থানায় তরমুজ চাষের সম্ভবনাও ভাল। রামু এবং চকোরিয়া থানায় কাউন, মশুর এবং রবি চীনাবাদাম চাষ করা যেতে পারে। টেকনাফ এবং উখিরা থানায় ধান ও পাট চাষের সম্ভবনা খুবই কম। জেলার সবগুলো থানাতেই গভীর পানির আমন চাষের সম্ভবনা বেশ ভাল।

বরগুনা জেলার একমাত্র বেতাগী থানা ব্যতীত অন্যান্য সব থানাতেই সন্তোষজনকভাবে স্থানীয় এবং উফশী জাতের রোপা আমন চাষ করা যেতে পারে। বেতাগী থানার সবচেয়ে চাষোপযোগী ফসল হলো কাউন। এ থানায় রবি মরিচ, রবি বজরা এবং দেশী পাট চাষের সম্ভাবনাও ভাল। জেলার প্রায় সব থানাতেই ব্যাপকহারে গভীর পানির আমন, রবি বজরা, মশুর এবং সরিষার চাষ করা যেতে পারে।

পটুয়াখালি জেলার দশমিনা, গলাচিপা এবং কলাপাড়া থানার প্রধান ফসল হলো উফশী জাতের আমন ও আউশ, স্থানীয় জাতের রোপা আমন এবং গভীর পানির আমন। এসব থানায় দেশী পাট, কাউন, মশুর, সরিষা, রবি, মরিচ এবং স্থানীয় জাতের রোপা আউশও চাষ করা যেতে পারে। দশমিনা এবং পটুয়াখালি সদর থানার কোনো কোনো এলাকা তরমুজ, বাঁধাকপি, ফুলকপি এবং রবি চীনাবাদাম চাষের জন্য উপযোগী।

ভোলা জেলার চরফেশান, দৌলতপুর এবং লালমোহন থানার জন্য গভীর পানির আমনই হলো সবচেয়ে উপযোগী ফসল। তমিজউদ্দিন থানার সবচেয়ে উপযোগী ফসল মশুর। কিন্তু এ জেলার সব থানাতেই মশুর, সরিষা, রবি মরিচ, রবি চীনাবাদাম, বাঁধাকপি, ফুলকপি এবং কাউন চাষের ভাল সম্ভাবনা আছে। চরফেশান থানায় তরমুজ চাষের সম্ভাবনাও খুব ভাল। মনপুরা থানায় সেচের মাধ্যমে কেবল রবি মরিচ চাষ করা যেতে পারে।

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া এবং ইন্দুরকানি থানায় লবণাক্ত মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। এ দুটি থানাতে স্থানীয় ও উফশী জাতের রোপা আমন ও আউশ, বোনা আউশ এবং রবি মরিচ চাষের সম্ভাবনা খুব ভাল। তবে কাউন, মশুর, সরিষা এবং গভীর পানির আমন ধানও চাষ করা যেতে পারে।

চট্টগ্রাম জেলার মিরেরসরাই, সন্দ্বীপ এবং সীতাকুণ্ড থানায় চাষের জন্য প্রথম পছন্দের শস্য হলো গভীর পানির আমন, সরিষা এবং কাউন। মিরেরসরাই এবং সন্দ্বীপ থানার কোনো

কোনো এলাকায় দেশী ও তোষা পাট চাষ করা যেতে পারে। ডবলমুরিং এবং পতেঙ্গা থানা গভীর পানির আমন চাষের জন্য উপযোগী। আনোয়ারা বাঁশখালি এবং পটিয়া থানা উফশী ও স্থানীয় জাতের রোপা আমন এবং আউশ চাষের বেশ উপযোগী। মিরেরসরাই, সীতাকুণ্ড, আনোয়ারা, বাঁশখালি এবং পটিয়া থানায় রবি মরিচ চাষের সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল।

নোয়াখালি জেলার পাঁচটি থানাই গভীর পানির আমন চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। এরপর কোম্পানিগঞ্জ এবং সেনবাগ থানা সরিষা, বেগমগঞ্জ দেশী পাট, হাতিয়া মশুর ও সরিষা এবং নোয়াখালি সদর স্থানীয় জাতের আমন চাষের জন্য বেশি উপযোগী। তবে অন্যান্য ফসল, যেমন— মশুর, কাউন, সরিষা (হাতিয়া ব্যতীত) এবং পাট (কোম্পানিগঞ্জ ব্যতীত) সব থানাতেই সন্তোষজনকভাবে চাষ করা সম্ভব। বেগমগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ এবং সেনবাগ থানায় রবি ভুট্টা চাষের সম্ভাবনাও খুব ভাল।

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি, রায়পুর এবং লক্ষ্মীপুর সদর থানায় লবণাক্ত মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। রামগতি ও লক্ষ্মীপুর থানায় বিশ প্রকারের অধিক শস্য চাষ সম্ভব। এ তিনটি থানার সবচেয়ে উপযোগী ফসল হলো গভীর পানির আমন, সরিষা, স্থানীয় জাতের রোপা আমন এবং মশুর। লক্ষ্মীপুর সদর এবং রায়পুর থানায় স্থানীয় রোপা আউশ বা উফশী জাতের আউশ, ছিটানো আউশ, রবি ভুট্টা, রবি জোয়ার, রবি চীনাবাদাম, তোষা পাট, বাঁধাকপি এবং ফুলকপি চাষের ভাল সম্ভাবনা বিদ্যমান। লক্ষ্মীপুর থানার কিছু কিছু এলাকা তরমুজ চাষের জন্যও বেশ উপযোগী।

ফেনী জেলার চারটি থানা যথা– ফেনী সদর, দাগন ভুঁইয়া, ছাগলনাইয়া এবং সোনাগাজি লবণাক্ততায় আক্রান্ত। এসব থানার সবচেয়ে উপযোগী ফসল হলো গভীর পানির আমন এবং এরপরই সরিষা ও মশুর। এ ছাড়া চারটি থানাতেই তোষাপাট, দেশীপাট রোপা আমন ও আউশ, রবি বাদাম, রবি ভুট্টা, বাঁধাকপি এবং ফুলকপি চাষের সম্ভাবনাও বেশ ভাল। এসব থানার কোনো কোনো এলাকা বোনা আউশ, রবি বজরা, রবি মরিচ, টমেটো এবং রবি সয়াবিন চাষের জন্য উপযোগী।

চাঁদপুর জেলার একমাত্র লবণাক্ত থানা হাইমচরের সবচেয়ে উপযোগী ফসল হলো সরিষা, এরপরই মশুর ও রবি চীনাবাদাম। তাছাড়া এ থানাতে ব্যাপকহারে কাউন, গভীর পানির ধান, বাঁধাকপি, ফুলকপি, স্থানীয় জাতের রোপা আমন, দেশীও তোষা পাট, বোনা আউশ এবং রবি ভুট্টা চাষ করা যেতে পারে।

### উপকূলীয় অঞ্চলের সম্ভাবনাময় শস্যবিন্যাস

উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত মৃত্তিকায় বর্ধিত শস্য উৎপাদন সম্ভাবনা লবণাক্ততা পরিশোধন, উন্নত সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং সুষ্ঠু মৃত্তিকা ও শস্য পরিচর্যার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এসব এলাকায় ধান প্রধানতম ফসল। বর্ষা মৌসুমে ব্যাপকহারে এ ফসলের চাষ করা হয়। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের দরুণ লবণের ঘনত্ব হ্রাস পায়, কারণ অতিরিক্ত লবণ চুয়ানো প্রক্রিয়ায় বৃষ্টির পানির সাথে মূল অঞ্চলের বাইরে চলে যায়, এর ফলে লবণের ঘনত্ব মান ধান

ফসলের সহ্যসীমার মধ্যে চলে আসে। তাই বর্ষা মৌসুমে ধান উৎপাদন সম্ভব হয়। গম, বার্লি, চীনাবাদাম, তুলা, জোয়ার প্রভৃতি ফসল ধানের চেয়ে অধিকতর লবণসহিষ্ণু, এজন্য লবণাক্ত এলাকায় উন্নত মৃত্তিকা ও শস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব ফসল চাষ করে সার্বিক কৃষি উন্নয়নে বেশ অবদান রাখা সম্ভব।

বিভিন্ন শস্যের লবণসহিষ্ণুতা, মৃত্তিকা উপযোগিতা, ভূমিসংস্থান, সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশদভাবে বিশ্লেষণপূর্বক উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত মৃত্তিকা থেকে আশানুরূপ ফলন লাভের লক্ষ্যে এলাকাভেদে বিভিন্ন শস্যবিন্যাস তৈরি করা হয়েছে (সারণি ১৮ দ্রষ্টব্য)। এরূপ শস্যবিন্যাস তৈরিতে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও মৌসুম, মৃত্তিকার বুনট শ্রেণী, আর্দ্রতা, আবহাওয়া ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে। উফশী জাতের ধান, গম এবং রবি শাক-সবজি চাষের জন্য পানি সেচের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। যদি সেচের জন্য উন্নতমানের পানি পাওয়া না যায়, তাহলে সীমিত পরিমাণে ঈষৎ লবণাক্ত পানি সেচকার্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেসব মধ্যম নিচু বা নিচু জমিতে অতিরিক্ত লবণ ও জলাবদ্ধতার কারণে শস্য চাষ সম্ভব নয়, সেসব জমিতে চিংড়ি চাষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চ লবণসহিষ্ণু ফসল, যেমন— বারমুদা ঘাস, সুদান ঘাস প্রভৃতিও আবাদ করা যেতে পারে।

### লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণে উন্নত চাষ পদ্ধতির ভূমিকা

উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত মৃত্তিকায় অন্যান্য ব্যবস্থাপনার সাথে কুশলী চাষ পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে প্রত্যাশিত ফলন লাভ করা সম্ভব। লবণাক্ত মৃত্তিকার জন্য উপযোগী এমন কয়েকটি পরিচর্যা সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

**১. জমি সমতলকরণ :** লবণাক্ত জমির উপরিস্তরের খুব সামান্যতম উঁচু-নিচু অবস্থাও উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত করতে পারে। কারণ উঁচু স্থান তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে সেই সবস্থানে লবণ জমা হয়ে গাছের বৃদ্ধির প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে পানিতল যদি উঁচুতে থাকে তাহলে এরূপ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। তাই বীজ অঙ্কুরোদ্গম ও গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার নিমিত্তে জমি খুব যত্নের সাথে সমতল করা প্রয়োজন।

**২. বিশেষ কর্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন :** রোপা আমন ধান কাটার পর রবি ফসল চাষ করার জন্য খুব অল্প সময় পাওয়া যায়। রবি মৌসুমে শুষ্ক আবহাওয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে মৃত্তিকা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং বড় বড় গভীর ও চওড়া ফাটলের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় প্রচলিত দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে জমি প্রস্তুত খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পরে। তাই ধান কাটার সাথে সাথে পাওয়ার টিলারের সাহায্যে জমি গভীরভাবে চাষ করতে পারলে বাষ্পীভবনহেতু নিচের লবণাক্ত পানি উপরে উঠে আসা বন্ধ হয়ে মৃত্তিকায় লবণের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং জমিও প্রস্তুত সহজ হয়।

**৩. জমি পতিত না রাখা :** জমি পতিত রাখলে বা কিছু সময় ধরে জমিতে ফসল না থাকলে জমির উপরিস্তরে লবণ জমার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। পানিতল মৃত্তিকার উপরিস্তরের দিকে অবস্থান করলে এরূপ অবস্থা আরওপ্রকট হয়ে উঠে। জমি বেশি সময় ধরে পতিত রাখলে, লবণ জমার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। তাই রবি মৌসুমে কোনো সময়ই জমি পতিত রাখা উচিত নয়। যতোটা সম্ভব সারা বছর ধরেই বিভিন্ন প্রকারের লবণসহিষ্ণু ফসল চাষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**৪. যথাযথ শস্যবিন্যাস অনুসরণ :** ভূ-সংস্থান এবং লবণাক্ততার ঘনত্বভেদে বিশেষ এলাকার জন্য যথাযথ শস্যবিন্যাস অনুসরণ করতে হবে (সারণি ১৮ দ্রষ্টব্য)। ফসল নির্বাচনে লবণসহিষ্ণু উদ্ভিদের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনতে হবে। উন্নত গুণসম্পন্ন পানি দ্বারা ঘন ঘন সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে লবণ দূরীভূত হয়ে মূল অঞ্চলের বাইরে চলে যায়, ফলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। দীর্ঘকালীন রবি ফসল মূল অঞ্চলে লবণ পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি করে, তাই রবি মৌসুমে স্বল্পকালীন লবণসহিষ্ণু ফসলের চাষ করা বাঞ্ছণীয়।

**৫. বপনপূর্ব পানিসেচ :** লবণাক্ত মৃত্তিকার বিদ্যুৎ পরিবাহিতা মান ৩ এর বেশি হলে বীজের অঙ্কুরোদগম ও বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে বীজ বপনের আগে প্রয়োজনে পানিসেচের মাধ্যমে লবণ দূরীভূত করে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা এবং গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখা যেতে পারে। এরূপ পানিসেচের ব্যবস্থা বীজ বপনের বেশ আগেই করতে হবে যাতে জমি প্রস্তুতের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। নালা পদ্ধতিতে সেচ দিলে তা বিশেষ সতর্কতার সাথে করতে হবে, কারণ ভেলির মাথায় বাষ্পীভবনহেতু লবণ বেশি পরিমাণে জমে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বীজ বপনের আগে ভেলির মাথা ভেঙে নিচু করে দিলে কিছুটা উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া ভেলিতে বীজ বপনের সঠিক স্থানটি অবশ্যই কুশলতার সাথে বের করতে হবে।

**৬. বীজ বপনের সঠিক স্থান নির্বাচন :** লবণাক্ত মৃত্তিকায় নালা পদ্ধতিতে লোনা পানি দ্বারা সেচ দিলে গাছের একর প্রতি অনুমোদিত সংখ্যা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পরে। এরূপ অবস্থা মোকাবেলার জন্য চাষীরা দুই-তিনগুণ বেশি পরিমাণ বীজ বপন করে অথবা বীজ বপনের ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন করে থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদগমের হার বৃদ্ধিকল্পে বীজের চারদিকে মৃত্তিকায় লবণাক্ততার ঘনত্ব হ্রাস করার ব্যবস্থা করা হয়। উপযুক্ত বপন পদ্ধতি, ভেলির আকার ও আকৃতি এবং সঠিক সেচ ব্যবস্থা অবলম্বন করে এটা করা সম্ভব। নিচে এরূপ বপন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো—

লবণাক্ত মৃত্তিকায় এক-সারি পদ্ধতিতে সারির দু'পাশ দিয়ে সেচ দিলে এবং বীজ ভেলির উপরে মাঝখানে বপন করলে এখানে পুঞ্জীভূত লবণে বীজের অঙ্কুরোদগম ভীষণভাবে ব্যাহত হয় (চিত্র ১৫ ক)। পক্ষান্তরে সারির এক পাশ দিয়ে সেচ দিলে সেচনালার উল্টো দিকে ভেলির শুকনো পাশে লবণ জমা হয় ফলে ভেলির মাঝখানে বা সেচ নালার দিকে বীজ বপন করে ভাল ফল পাওয়া যায় (চিত্র ১৫ খ ও গ)। দু-সারি পদ্ধতিতে ভেলি কিছুটা বেশি

## সারণি ১৮ : ভূ-সংস্থান এবং লবণাক্ততার ঘনত্বভেদে শস্যবিন্যাসের রূপ

| লবণাক্ততা শ্রেণী | ভূ-সংস্থান | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | উঁচু জমি | | মধ্যম উঁচু জমি | | মধ্যম নীচু জমি | |
| | খরিপ | রবি | খরিপ | রবি | খরিপ | রবি |
| এস-১ ($2\text{-}4\ ds m^{-1}$) খুবই কম লবণাক্ত | বোনা আউশ<br>মরিচ<br>চীনাবাদাম<br>স্থানীয় রোপা আমন<br>উচ্চ ফলনশীল আমন<br>ফল-ফলারী | ডাল<br>পিয়াজ<br>তরমুজ<br>গম<br>মরিচ<br>সরিষা<br>ফল-ফলারী<br>শাক সবজি<br>সূর্যমুখী | বোনা আউশ<br>স্থানীয় রোপা আমন<br>উচ্চ ফলনশীল আমন | ডাল<br>সরিষা<br>মরিচ<br>শাকসবজি<br>গম<br>আলু<br>কাউপি<br>তরমুজ<br>সূর্যমুখী | বোনা আউশ<br>বোনা আমন<br>স্থানীয় রোপা আমন | উফশী বোরো<br>সরিষা<br>ডাল<br>গম<br>মিষ্টি আলু |
| এস-২ ($4\text{-}8\ ds\ m^{-1}$) মধ্যম লবণাক্ত | বোনা আউশ<br>মরিচ<br>শসা<br>স্থানীয় রোপা আমন | সয়াবিন<br>চীনাবাদাম<br>কাউপি<br>শাক<br>মরিচ<br>শসা<br>সরিষা | বোনা আউশ<br>স্থানীয় রোপা আমন<br>উফশী রোপা আমন | সরিষা<br>ধঞ্চে<br>কাউপি<br>সয়াবিন<br>মরিচ<br>চীনাবাদাম<br>গম<br>উফশী বোরো<br>মিষ্টি আলু<br>সূর্যমুখী | বোনা আউশ<br>বোনা আমন<br>স্থানীয় রোপা আমন | সয়াবিন<br>সরিষা<br>গম<br>শাক<br>মিষ্টি আলু |
| এস-৩ ($8\text{-}16\ ds\ m^{-1}$) বেশি লবণাক্ত | বারমুদা ঘাস<br>শসা<br>তুলা<br>জোয়ার<br>স্থানীয় রোপা আমন | গম<br>বার্লি<br>শসা<br>তুলা<br>জোয়ার | *Sesbania*<br>জোয়ার<br>স্থানীয় রোপা আমন | বাঁধা কাপ<br>বার্লি<br>তুলা<br>গম<br>জোয়ার | *Sesbania*<br>স্থানীয় রোপা আমন | বার্লি<br>তুলা<br>গম |
| এস-৪ ($> 16\ ds\ m^{-1}$) খুব বেশি লবণাক্ত | তুলা<br>বারমুদা ঘাস<br>সুদান ঘাস | তুলা<br>বার্লি | —<br>তুলা | —<br>তুলা | —<br>তুলা | —<br>তুলা<br>বার্লি |

প্রশস্ত করে এর দু'পাশ দিয়ে সেচ দিলে ভেলির মাঝখানে উপরে লবণ পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, ফলে ভেলির দু'মাথার দিকে বীজ বপন করলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম বা প্রাথমিক বৃদ্ধি মাঝখানে পুঞ্জীভূত লবণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না (চিত্র ১৫ ঘ)। এরূপ পদ্ধতিতে ভেলির এক পাশ দিয়ে সেচ দিলে উল্টো দিকে লবণ জমা হয়, ফলে এর উল্টো দিকে বীজ বপন করেও আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় (চিত্র ১৫ ঙ)।

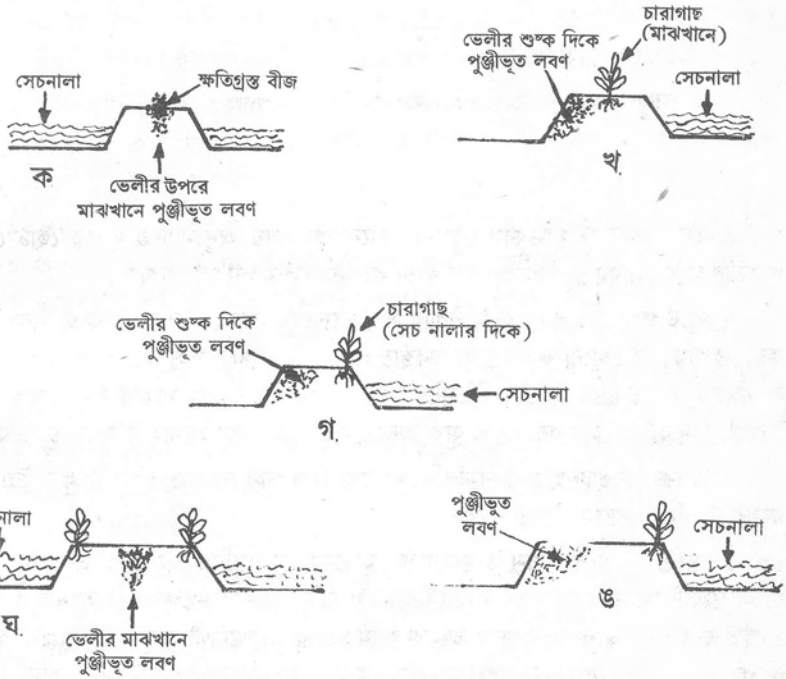


চিত্র ১৫ : ভেলির উপর বীজ বপন পদ্ধতি

বর্ণিত পদ্ধতিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া না গেলে সেচ নালায় সেচের পানির গভীরতা বৃদ্ধি করে এরূপ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এছাড়া ভেলির পাশ কিছুটা ঢালু করে এক বা দু'সারি পদ্ধতিতে ঢালে বীজ বপন করে লবণাক্ততার হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে (চিত্র ১৬ ক ও খ)।

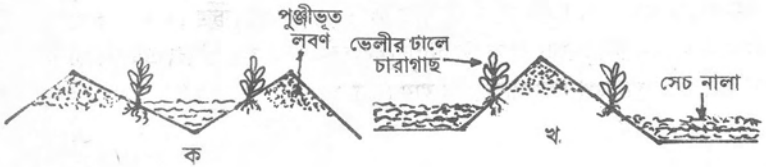


চিত্র ১৬ : ভেলির ঢালে বীজ বপন পদ্ধতি

এ ছাড়া লবণাক্ত মৃত্তিকায় কোনো কোনো এলাকায় অনুমোদিত দূরত্বে ছোট ছোট অগভীর গর্তে (dibbling) আউশ ধান বপন করেও ভাল ফলন পাওয়া যায়।

**৭. সার প্রয়োগ :** লবণাক্ত মৃত্তিকার সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। যে কোনো ফসল চারা অবস্থায় লবণের অপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। তাই লবণাক্ত মৃত্তিকায় চারা অবস্থায় স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক কম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা উচিত। গাছ বড় হওয়ার পর অবস্থা বুঝে অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাদি ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন লবণাক্ত এলাকার কৃষি উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

**১. মৃত্তিকা পরিশোধন :** লবণাক্ত মৃত্তিকা রাসায়নিকভাবে পরিশোধন করে চাষোপযোগী করে তোলা যায়। সমুদ্রের জোয়ার বা জলচ্ছ্বাসে উপকূলবর্তী অনেক এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়, ফলে লবণ জমে অনেক জমি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে জিপসাম ($Ca\ SO_4.2H_2O$) প্রয়োগে এসব জমির মৃত্তিকা পরিশোধন করে তোলা যায়। মৃত্তিকা সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হলে পানির সোডিয়াম কর্দমসমূহ মৃত্তিকাস্থ ক্যালসিয়ামকে কর্দমকণা থেকে বিচ্যুত করে। এভাবে উদ্ভূত সোডিয়াম কর্দমসমূহ মৃত্তিকার দানা ভেঙে সূক্ষ্মতর করে ফেলে। এর ফলে মৃত্তিকা ভয়ানক আঠালো হয়ে চাপ বেঁধে যায় এবং এরূপ মৃত্তিকায় সহজে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকা অভ্যন্তরে পানি ও বায়ু চলাচল বিঘ্নিত হয়। এ জাতীয় মৃত্তিকা শস্য চাষের জন্য আর উপযোগী থাকে না। একে সোডিক মৃত্তিকা বলা হয়। এরূপ মৃত্তিকা জিপসাম প্রয়োগের মাধ্যমে পরিশোধন করা যায়। জিপসামের ক্যালসিয়াম নিম্নলিখিত উপায়ে মৃত্তিকা কণা থেকে সোডিয়াম বিচ্যুত করে তার পূর্ব স্থান দখল করে।

$$Na^{++}\boxed{\text{micelle}} + CaSO_4 \rightleftarrows Ca^{++}\boxed{\text{micelle}} + 2Na^{+}+SO_4^{--}$$

উদ্ভূত সোডিয়াম এবং সোডিয়াম সালফেট পানিতে দ্রবণীয় বিধায় চুয়ানো প্রক্রিয়ায় পানির সাথে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, ফলে মৃত্তিকার ভৌত ধর্ম এবং রাসায়নিক ও জৈবিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার উন্নতি ঘটায় মৃত্তিকার উন্নতি ঘটে। জমিতে পুনরায় স্বাভাবিক চাষাবাদ সম্ভব হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে এভাবে লবণাক্ত মৃত্তিকা পরিশোধন করে চাষাবাদ করা সম্ভব। এছাড়া ক্যাটায়নসমৃদ্ধ উন্নত মানের পানি দ্বারা বার বার সেচের মাধ্যমে চুয়ানো প্রক্রিয়ায় বিনিময়ী সোডিয়াম দূরীভূত করে মৃত্তিকার উন্নতি সাধন করা যায়।

২. **বাঁধ নির্মাণ :** লবণাক্ত এলাকার বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করে সমুদ্রের লোনা পানির প্রবেশ বন্ধ করে অনেক জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের উপকূলে বরাবর ৪,২০০ কি.মি. এর অধিক বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

৩. **জলাধার নির্মাণ :** যথাযথ স্থানে বড় বড় পুকুর কেটে উন্নত গুণসম্পন্ন পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ পানি দ্বারা প্রয়োজনে সেচ দিয়ে লবণাক্ততার মাত্রা কমিয়ে ফসলের ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা যায়।

৪. **লবণসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন :** গবেষণার মাধ্যমে অধিকতর লবণসহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে হবে। এ জাতীয় শস্যের বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে তা কৃষকদের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে হবে। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অতি সম্প্রতি লবণাক্ততা সহিষ্ণু বি আর ৬১০৭-আর-১১ নামে একটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে।

৫. **জাবড়া ব্যবহার :** খড়-কুটা জাতীয় জাবড়া (mulch) ব্যবহার করে বাষ্পীভবন হ্রাস করার মাধ্যমে মৃত্তিকার উপরিভাগে লবণ পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস করা যায়, ফলে ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না।

উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় মিষ্টি আলুর উপর কচুরিপানা জাবড়ার প্রভাব নির্ণয় করার লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক একটি পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এতে দেখা যায়, যে প্লটে জাবড়া ব্যবহার হয় সে প্লটে মৃত্তিকার লবণাক্ততা হ্রাস পাওয়ায় অধিকাংশ গাছ টিকে থাকে এবং বৃদ্ধিও সন্তোষজনক হয়। পক্ষান্তরে, জাবড়াবিহীন প্লটে অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে গাছের সংখ্যা হ্রাস পায়।

## পাহাড়ী মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের তিনটি জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি পাহাড়ী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এসব জেলায় এখনো প্রধানত ঝুম বা অস্থায়ী চাষের (shifting cultivation) প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্থানীয় উপজাতীয়গণ একটি পাহাড়ে ২-৩ হেক্টর জমিতে ২-৩ বছর একনাগাড়ে চাষ করে। এরূপ অবস্থায় পাহাড়ের উপরিস্থিত উর্বর মৃত্তিকা দিনের পর দিন অপসারিত হয়ে সমস্ত এলাকা এক অনুর্বর ভূমিতে পরিণত হচ্ছে, ফলে শস্যের ফলনও আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

BANSDOC Library
Accession No. 18599

কৃষি পরিবেশিক অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ হিসেবে এ তিনটি জেলা উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানত উচ্চ ভূমি, খাড়া ঢাল এবং গভীর খাদসম্পন্ন মৃত্তিকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। বাংলাদেশের মোট জমির শতকরা প্রায় ৮ ভাগ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এখানকার মৃত্তিকায় পাহাড়ী অধক্ষেপ, বালিপাথর এবং পলি পাথরের প্রাধান্য বিদ্যমান। মৃত্তিকা বুনট বেলে দো-আঁশ থেকে এঁটেল দো-আঁশ। এ অঞ্চলের মৃত্তিকা প্রধানত অম্ল। $P^H$ ৪ থেকে ৫ এর মধ্যে। বর্ণ লালচে বা বাদামি। পাহাড়ের উপরিভাগ ও ঢালের মৃত্তিকা সুনিষ্কাশিত। পাহাড়ের পাদদেশে মৃত্তিকা কিঞ্চিত মন্দ নিষ্কাশিত।

এ অঞ্চলের সুষ্ঠু কৃষি উন্নয়নের পথে অনেক সমস্যা বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— মৃত্তিকার খাড়া ঢাল ও গভীর খাদ, ভূমিক্ষয়, প্রচলিত ঝুম চাষ পদ্ধতি, দরিদ্রতা, মন্দ যাতায়াত ব্যবস্থা এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তির অভাব। এ সমস্ত সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাহাড়ী অঞ্চলে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।

পাহাড়ের উপরিভাগে, ঢালে এবং পাদদেশে কোন জাতীয় ফসল, কোন পদ্ধতি আবাদ করলে সর্বোচ্চ ফলন লাভ করা যায় তা উদ্ভাবন করা আশু প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট কলা-কৌশল উদ্ভাবন করা হয়নি। অভিজ্ঞতার আলোকে আনারস, চা, কফি, কলা, লেবু, রাবার, বিভিন্ন কাঠজাতীয় বৃক্ষ, তুলা, শাক-সবজি প্রভৃতি ফসল চাষাবাদ করা হচ্ছে। উচ্চতাভেদে একটি পরীক্ষিত শস্যবিন্যাস পাহাড়ী জমির সুষ্ঠ ব্যবহার তথা কৃষি উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে পারে।

পাহাড়ী এলাকার উপযোগী জমি কর্ষণ, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এবং বপন পদ্ধতি ভূমিক্ষয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এসব পদ্ধতিতে ভূমির উচ্চতাভেদে যেমন— পাহাড়ের উপরিভাগে কাঠজাতীয় বৃক্ষ, ঢালে আনারস, লেবু, কমলা, তুলা, রাবার, কফি, মশলা ও ফল-মূল এবং পাদদেশে ধান, গম, শাক-সবজি প্রভৃতি চাষ করে মৃত্তিকার যথাযথ উর্বরতা রক্ষাপূর্বক কৃষি উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ঝুম চাষ পদ্ধতি পাহাড়ের মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবন বৃদ্ধি করছে। ঝুম চাষের জন্য উন্মুক্ত করা পাহাড়ের উপরের উর্বর মৃত্তিকা বৃষ্টিতে স্থান্তরিত হয়ে সমস্ত এলাকা অনুর্বর ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এরূপ চাষ পদ্ধতি অবশ্যই বন্ধ করে কন্টুর, ধাপ অথবা খণ্ড জমি চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করে মৃত্তিকার ক্ষয়ীভবন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

### বেলে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকায় ৮৮-১০০ ভাগ বালি কণা থাকলে তাকে বেলে মৃত্তিকা বলে। জৈব পদার্থবিহীন এ জাতীয় মৃত্তিকা সম্পূর্ণ অনুর্বর। পানি ধারণ ক্ষমতা খুব কম, পানি ও বায়ু ভূমিক্ষয় বেশি। কাদা কণার অভাবে মৃত্তিকা সংযুক্তি নাই বললেই চলে। সাধারণত নদীর কূল ঘেষে এরূপ মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, কিছু ডালজাতীয় ফসল এসব মৃত্তিকায় চাষ করা যেতে পারে।

এ জাতীয় মৃত্তিকা বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভৌত ধর্মের উন্নয়নপূর্বক আশানুরূপ ফসল উৎপাদনে সক্ষম। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

**১. জৈব পদার্থ প্রয়োগ :** পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব পদার্থ বা পচা মাটি প্রয়োগ করে এরূপ মৃত্তিকা উন্নত করা যেতে পারে। হেক্টর প্রতি ২৫–৩০ টন জৈব পদার্থ প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

**২. সবুজ সার প্রয়োগ :** বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার পর পরই এ জাতীয় মৃত্তিকায় খেশারি বা মাশকলাই জাতীয় ফসল সবুজ সার হিসেবে চাষ করে মৃত্তিকার উন্নতি সাধন করা সম্ভব। তাছাড়া শন বা ধঞ্চেও সবুজ সার হিসেবে চাষ করা যেতে পারে।

**৩. চাপড়াজাতীয় ফসলের চাষ :** মৃত্তিকা ক্ষয়ীভবন হ্রাসের জন্য চাপড়া বা দূর্বাজাতীয় ঘাস চাষ করে মৃত্তিকা ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে পানি বা বায়ুজনিত ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা হ্রাস পায়।

**৪. অধিক কিস্তিতে সার প্রয়োগ :** বেলে মৃত্তিকায় খুব তাড়াতাড়ি চুয়ানো প্রক্রিয়ায় পুষ্টি উপাদান শিকড় অঞ্চলের বাইরে চলে যায়। তাই অল্প মাত্রায় কিস্তিতে ঘন ঘন সার প্রয়োগ করা উচিত যাতে প্রয়োগকৃত সারের সবটুকুই গাছ গ্রহণ করার সুযোগ পায়।

**৫. পানি সেচ :** বেলে মৃত্তিকায় আশানুরূপ ফলন লাভে প্রয়োজনীয় পানি সেচের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা খুব কম বলে ঘন ঘন পানি সেচের দরকার হয়।

# গ্রন্থপঞ্জি


১. আরাকারি ও অন্যান্য। *ভারতের মৃত্তিকা পরিচর্যা।* ১৯৮১। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. আমিন, সদরুল। *বাংলাদেশের মৃত্তিকার পরিচিতি ও ব্যবহার।* ১৯৯০। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

৩. কুদ্দুস ও তালুকদার। *কৃষিতত্ত্বের মৌলনীতি।* ১৯৯৩। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪. কোন্‌কে এইচ। *মৃত্তিকা পদার্থবিদ্যা।* ১৯৮৬। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫. রশিদ ও অন্যান্য। *সার ব্যবহারের কলাকৌশল।* ১৯৮৭। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

৬. রাই এম. এম.। *মৃত্তিকা বিজ্ঞানতত্ত্ব।* ১৯৮৬। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭. কৃষি ডাইরি। ১৯৯৫। কৃষিতথ্য সংস্থা, খামারবাড়ি।

৮. *সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ম্যানুয়েল।* ১৯৯২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

৯. Brady, N. C. *The Nature & Properties of Soil.* 1984. Macmillan Publishing Comp, New York.

১০. Donahue, *et al. Soils, An Introduction to Soil and Plant growth.* 1990. 5th Edition, Prentice Hall of India, Delhi.

১১. Donahue, R.L. *Our Soils and Their Management. 2nd edn.* 1963. Asia Publishing House.

১২. Hughes & Henson. *Crop Production, Principles & Practices.* 1957. The Macmillan Comp., New York.

১৩. Karim, *et al. Coastal Saline Soils & Their Management in Bangladesh.* 1983. BARC, Dhaka.

১৪. Karim, *et al. Salinity Problems & Crop Intensification in the Coastal Regions of Bangladesh,* 1990. BARC, Dhaka.

১৫. Kipps, M.S. *Production of field crops.* Tata McGrow Hill Publishing Comp. Ltd., New Delhi.

১৬. Michael, A.M. *Irrigation, Theory & Practice.* Vikas Publishing House Ltd., New Delhi, India.

১৭. Rama Daos, M.S.V. *Soil Conservation in India.* Sob Press, India.

১৮. Somani & Bhandari. *Soil Micro-organisms and Crops growth.* 1989. Divyajoyti Prakashan, Sodhpur, India.

১৯. Thomson & Traeh. *Soils & Soil Fertility.* 4th Edition. 1989. Tata MacGraw Hill Publishing Comp. Ltd. New Delhi, India.

২০. Tisdale, S.L & Nelson, W.l. *Soil Fertility & Fertilizers.* 1968. Macmillan Comp., New York.

২১. Tisdale, S.L & Nelson, W.l. *Soils of Bangladesh.* 1983. CERDI, Joydebpur, Gazipur.

২২. *Land & Soil Data/Information of Coastal Areas of Bangladesh.* 1994. SRDI, Dhaka.

২৩. *Soil Conservation for Developing Countries.* 2nd print. 1978. FAO, Rome

২৪. *Annual Report.* 1989-90. BARI, Joydebpur, Gazipur.